সম্পাদকীয় : আগ্রাসনকারীরা দূর হও! এখনই!
গোয়া : পর্বতের ওপর রক্ত
সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তন
পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির সমস্যায় পরমাণু বিদ্যুৎ কোন সমাধানই নয়
অশনি সংকেত : রাঁচীতে ছোটো কারবারিদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ
গুজ্জরদের প্রতিবাদ এবং সংরক্ষণের রাজনীতি
গণহত্যার অর্থ
ওরা চাষ-ই করে
সাচার রিপোর্টে নারী
পাঠকসভার বিবরণ
'টপ কোয়ার্ক'-এর রূপকার আজ আর নেই
চিঠিপত্র
১. নন্দীগ্রাম-খেজুরীতে সেনা তলবের আহবান
২. নন্দীগ্রাম

সম্পাদকীয় : আগ্রাসনকারীরা দূর হও! এখনই!

১৬ জুন নিউ ইয়র্ক শহরে আমেরিকার যুদ্ধ-বিরোধী সংগঠকেরা এক জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ওয়াশিংটনে মার্কিন কংগ্রেসে যখন ২০০৮ সালের জন্য যুদ্ধের মার্কিনী বরাদ্দ নিয়ে আলাপ চলবে,মঠিক তখনই ২২ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের সামনে যুদ্ধ-বিরোধী সমাবেশ করা হবে। ২৯ সেপ্টেম্বর হোয়াইট হাউস অভিমুখে মিছিলে হাঁটবে যুদ্ধ বিরোধীরা। কর্পোরেট যুদ্ধমনস্ক মার্কিন কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ঐ সময় ওয়াশিংটনে জনসাধারনের একশান্তি কংগ্রেসে আন্দোলন সংক্রান্ত আলোচনার বিষয় হবে:

- ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়।
- ইরাক থেকে প্যালেস্টাইন, ফিলিপাইন্স, হাইতি, পুয়ের্তো রিকো, আফগানিস্তান – সমস্ত দখলদারি খতম করো, এখনই।
- যুদ্ধাপরাধের জন্য বুশ ও চেনীকে অভিযুক্ত কর।
- কিউবা, ভেনেজুয়েলা, জিম্বাবুয়ে এবং সুদানের উপর মার্কিনী খবরদারি বন্ধ কর।
- অভিবাসী এবং নথিবিহীন শ্রমিকদের উপর হামলা বন্ধ কর।
- ক্যাটারিনা দুর্গতদের প্রতি সুবুচার কর – বর্ণবিদ্বেষী পুলিশি সন্ত্রাস বন্ধ কর।
- মামিয়া আবু জামাল সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত কর।
- বিরামহীন যুদ্ধে নয়, স্বাস্থ্য-কাজ-শিক্ষায় অর্থ চাই।

যুদ্ধ-বিরোধী সংগঠকেরা বেশ বুঝতে পারছেন, মার্কিন কংগ্রেস কখনোই যুদ্ধের অবসান ঘটাবে না। জনসাধারনকেই তা ঘটাতে হবে। তবে মামুলি মিছিল আর প্রতিবাদ করে তা আর হবে না। সময় এসেছে প্রতিরোধের, ওয়াশিংটনের সদর দপ্তরকে অচল করে দিতে হবে।

আমরা যারা ভারতে, পাকিস্তানে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশে দেশে ইরাক-আফগানিস্তান-ইরানের তালিকাভুক্ত হওয়ার দিন গুণছি, তারা এই রাজনৈতিক উদ্যোগে কিভাবে সারা দেব? আমরাও কি কেবল মামুলি যুদ্ধ-বিরোধী মিছিল সভায় আটকে থাকব?

ইরাকে আমরা একধরনের ছলনাময় নাছোরবান্দা আগ্রাসন লক্ষ্য করেছি। আমাদের দেশে প্রতিটি রাজ্যে 'শিল্পায়ন'-এর নামে, SEZ-এর নামে, সংগঠিত খুচরো ব্যবসার নামে যা আসছে, তারও কি ঐ ছলনাময় নাছোরবান্দা আগ্রাসী চেহারা নয়? 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ', 'উন্নয়ন', ইত্যাদি আউড়ে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে এক ছলনাময় প্রচারমুখীনতা। কর্পোরেট ব্যাঙ্কগুলির মতোই তা নাছোড়বান্দা ও মারমুখীও বটে। ইরাককে সামরিক-রাজনৈতিকভাবে দখল করা হয়েছে। SEZ-গুলিও কি একপ্রকার রাজনৈতিক দখল নয়। বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য প্রচলিত আইনগত-প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়ার অধিকারের মাধ্যমে এই দখলদারি কায়েম হতে চলেছে।

হয় তা নির্বিঘ্নে কায়েম হবে, আর না হয় তার প্রতিরোধ হবে। কোনও মিছিল-সভা-প্রচারপ্রত্রের প্রচলিত প্রতিবাদে এর ভ্রুক্ষেপ নেই; বরং বড়ো মিডিয়ার গণতান্ত্রিক ভড়ংয়ের মধ্যে অনেকখানিই এসবকে হজম করে ফেলার ব্যবস্থা হয়েছে।

যেমনটা দেখা গেল জার্মানীর হেলিগেণ্ডামে G8 শীর্ষ সম্মেলনে। আস্থাভাজন হিসেবে স্বীকৃত মিডিয়া-প্রতিনিধিদের জন্য ছিল ঢালাও খাদ্য-পাণীয়-বিনোদন সহ আরামদায়ক আশ্রয়ের বন্দোবস্ত। আর ছিল ট্রেনে চেপে নিরাপদে হেলিগেণ্ডামের সম্মেলন স্থলে পৌঁছনোর পথের দুপাশে কাঁটাতারের পাঁচিল, যাতে তারা ইচ্ছামতো বিক্ষোভকারীদের কাছে যেতে না পারে। তাদের দেওয়া নির্দেশ-পুস্তিকায় অন্য পথে আসা-যাওয়া নিষেধ করা ছিল। আস্থাভাজন হিসেবে অস্বীকৃত মিডিয়া-কর্মীরা ছিল কাঁটাতারের বাইরে, যেমন ছিল বিক্ষোভকারীরা। তবে সেখানেও দুটি ধারা – প্রতিরোধকারী ও প্রচার-প্রোপাগাণ্ডাকারী। প্রতিরোধকারীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আমন্ত্রিতদের প্রবেশপথগুলিতে অবরোধ করে। জলকামান নিয়ে ঘোড়ায় চেপে অবরোধকারীদের আক্রমণ করে নিরাপত্তা কর্মীরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীতে এত ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আর দেখা যায়নি। ৬ জুন ১০০০০ এর বেশি মানুষ অবরোধে অংশগ্রহণ করে। অবরোধের ফলে আমন্ত্রিতদের জলপথ ও হেলিকপ্টারে সম্মেলন-স্থলে পৌঁছে দেওয়া হয়। হেলিগেণ্ডামের সম্মেলন-স্থলকে সুরক্ষিত করতে ১২ কিমি. লম্বা কাঁটাতারের পাঁচিল দেওয়া হয়েছিল।

ছলনাময় নাছোড়বান্দা আগ্রাসনকে ঘিরে বাড়ছে পাঁচিলের দৈর্ঘ্য, বাড়ছে প্রতিরোধ। আওয়াজ উঠছে : আগ্রাসনকারীরা দূর হও! এখনই!

গোয়া : পর্বতের ওপর রক্ত

Down to Earth, ১৫ এপ্রিল ২০০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত সুনীতা নারায়ণ-এর সম্পাদকীয় বাংলায় অনুবাদ করেছেন গৌরাঙ্গ সেনগুপ্ত।

এক বিশাল খনি এবং স্তব্ধ এক জলাধারের মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে। স্থানীয় কর্মীরা আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, এই লৌহখনি সালাউলিম জলাধারের নহরে রয়েছে। এটাই দক্ষিণ গোয়ার একমাত্র জলের উৎস। যেই আমি ক্যামেরায় ছবি তুলতে গেলাম, তখনই এক জিপভর্তি লোক এসে আমাদের ঘিরে ফেলল। তারা নিজেদের পরিচয় দিল খনি-কর্তৃপক্ষ বলে। আর আমাদের তখনই স্থানত্যাগ করার নির্দেশ দিল কর্কশভাবে। আমরা যুক্তি দিতে গেলাম, আমরা তো সর্বসাধারণের রাস্তা ধরে আসার পথে তেমন কোন নোটিশ বোর্ড দেখিনি যে আমরা অনধিকার প্রবেশ করেছি। কিন্তু ওরা আমাদের কোন কথা শুনতেই চাইল না। বরং আমাদের গাড়ির চাবি কেড়ে নিয়ে পাথর কুড়িয়ে আমাদের দিকে ছুঁড়তে ছুঁড়তে অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করল। অবস্থা হাতের বাইরে চলে যাবার আগেই আমরা দ্রুত গাড়ি চালিয়ে পালিয়ে এলাম, ছবিটবি না তুলেই।

দেখে-শুনে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত আমরা — এই তো সেই পরিচিত বালুকাতট, সবুজে মোড়া পর্বত আর শান্ত স্তব্ধ গোয়া। এই সেই গোয়া, যেখানে ডেম্পো, সালগাওকার, টিম্বলোরা আছে খনির স্বার্থে। কিন্তু তারা তো আবার শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা উত্তম কর্পোরেট পরিচালন-নীতির প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তবে তারা জলের একমাত্র উৎসস্থলে খনির কাজ কীভাবে মেনে নেয়? এই আপাত স্বর্গে হিংসা আর উত্তেজনাই বা কী জন্য? অচিরেই এর উত্তর পাওয়া গেল।

পরবর্তী গ্রাম কলম্‌বায় পৌঁছে আবার আমরা ঘেরাও হলাম — না দুর্বৃত্ত খনির প্রতিনিধিরা নয়, আমাদের ঘিরে ধরেছিল গ্রামের মহিলারা। আমরা তখন একটা টিলার ওপরে — ওপর থেকে নারকেল আর কাজুবাদাম গাছ দিয়ে ঘেরা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে বুলডোজার, বড়ো যন্ত্রপাতি আর ট্রাকে নিয়ত কর্মরত মানুষেরা — ওরা পাহাড় ভেঙে মাটি উঠিয়ে খনির গর্ত করছে। ইতিমধ্যে স্থানীয় নদীগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে। সবুজ ফসল আর গাছে ভরা মাঠ লাল বর্জ্যে পূর্ণ হয়ে চলেছে নদী পর্যন্ত, গ্রাস করছে নদীকেও। ওরা আমাদের টেনে নিয়ে গেল ওদের গ্রামে। ক্রুদ্ধ মহিলারা আমাদের দেখাল, কীভাবে টন টন লাল বর্জ্যে মাঠ থেকে নদী পর্যন্ত ভরাট হয়ে চলেছে। খনি ফাটানোয় কীভাবে দেবকী কাটু ভেলিপ-এর বাড়ির দেওয়াল ভেঙেছে, ওরা তাও দেখাল। ওরা যখন প্রতিবাদ করতে গেল, ওদেরকে জানানো হল, প্রতিবাদ করলে বাড়িটাও ধূলিসাৎ করা হবে।

গ্রামীণ মানুষের একটিই দাবি ছিল : খনি বন্ধ করো। ওদের মত না নিয়ে এই খনির কাজ করার অনুমতি কী করে পেল এইসব তথাকথিত খনি-মালিকেরা? এই কোম্পানিগুলো কাদের? আর ওরা কাদেরই বা জমি কাজে লাগাচ্ছে? জানতে পারলাম যে এই শিক্ষিত রাজ্যে খনির কাজ অত্যন্ত গোপনীয়তায় আবৃত। এই জমিগুলি আগে পর্তুগীজ সরকারের আওতায় ছিল — সেই বিদেশি সরকার নামমাত্র রাজস্বের বিনিময়ে গ্রামবাসীদের চাষের জন্য দীর্ঘমেয়াদী লিজ দিয়েছিল এবং ভারত সরকার গোয়া দখল করার পর সেই লিজ ভারত সরকারের নামে পরিবর্তিত হয়ে যায়। কাজেই বর্তমান খনি কোম্পানিগুলি হয়ত শর্তসাপেক্ষে পরিবেশ দপ্তরের ছাড় পেয়েছে, কিন্তু ওই কৃষিজমিগুলির চরিত্র তো তাতে বদলায়নি।

এখন, জমির মালিকানা (বা ব্যবহার) কার বা কাদের এই প্রশ্নের উত্তর নাকি খুব পরিষ্কার নয়, এমনটাই সন্দেহ করছে গ্রামবাসীরা। জনৈক হীরালাল খোদিদাস ওরকম একটা জমির লিজগ্রহীতা, কিন্তু এক দালাল রসিক নায়েক সেটি নিয়েছে সোসিদাদে ফর্মেন্টো নামে গোয়ার অন্যতম বৃহৎ এক খনি কোম্পানির নামে। রসিক আবার কাজটি দিয়েছে ওই গ্রামেরই প্রাক্তন প্রধান গুরুদাস নায়েককে। অনুমান করা যায় কেন কোম্পানির নামের কোনো সাইনবোর্ড দেখা যায়নি কোথাও। মূল কোম্পানিগুলি হয়ত আত্মপরিচয় দিতে চায় না।

পরবর্তী কুইনামোল গ্রামের অবস্থাও কমবেশি একই রকম। খনি কোম্পানিগুলি মোটের ওপর দুর্ধর্ষ — গ্রামবাসীরাও চটে রয়েছে। তফাৎটা এই যে ওখানকার খনি বহুদিন আগের। প্রথমে সেখানে ম্যাঙ্গানিজ আকর তোলা হয়েছিল, এখন আবার খনন চলছে লৌহ আকরিকের জন্য। এর ফলে বর্জ্যের পরিমাণ এখানে অনেক বেশি, যা মাঠ ও জলের উৎসকে শুধু ঢেকেই দেয়নি, ছোটোখাটো এক বর্জ্য-পাহাড় গড়ে তুলেছে। গ্রামবাসীরা যে চরম উত্তেজিত তার কারণ আছে। জনৈক রাজনৈতিক ব্যক্তি চন্দ্রকান্ত নায়েক খনির লিজ পেয়েছিল। আর তার কাজের দায়িত্ব পেয়েছিল জনৈক ভাণ্ডারি। এর চেয়ে বেশি কিছু আর জানা যায় নি।

গ্রামের মহিলারা বহু স্তরে প্রতিবাদ জানালেও কেউ কর্ণপাত করেনি। ওখান থেকে ফিরে আসার পরদিন জানা গেল যে গ্রামবাসীরা খনি আকরিক ভর্তি একটি ট্রাক আটকে তার চালককে মারধোর করেছে। গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। দোষটা কি গ্রামবাসীদের?

যে কটি গ্রাম ঘোরা হল, একই অবস্থা। কেন এমন অবস্থা? এই গ্রামগুলি দরিদ্র নয়, জীবিকানির্বাহের জন্য বা অর্থোপার্জনের জন্য কারোর ওপর নির্ভরশীল নয়। এ পর্যন্ত গ্রামগুলি যথেষ্ট উন্নত — কৃষির নিয়মিত উৎপাদনই এদের আর্থিক উন্নতির মূলে। আর এই গ্রামগুলিকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করার দিকে নিয়ে যাচ্ছে যথেচ্ছ খনিজ সম্পদ আহরণকারীরা। চীনে খনিজ সম্পদের মূল্য আকাশছোঁয়া, তাই যে কোনভাবেই দখল করো স্থানীয় এই সমৃদ্ধ গ্রামগুলিকে, যথেচ্ছ খনি সম্পদ আহরণের নামে।

ভীচুন্দ্রেম গ্রামে গিয়ে প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পাওয়া গেল। সেখানে গাড়ি আটকে গেল এক বিশাল বোল্ডারের ব্যারিকেডে। পাহাড়ে ওঠার পথে গ্রামবাসীদের এই প্রতিরোধ — সাদাসিধে, কিন্তু যথেষ্ট কার্যকর। ঘোষিত সরকারি বনাঞ্চলে ঘেরা এই গ্রামের চাষজমিতে খনি-মালিকদের প্রবেশ রুখতেই এই পথ আটকানো। এক পাহাড়ি নদী এদের সেচের প্রয়োজন মেটায়। সবুজ ফসলে ভরা নয়নাভিরাম মাঠ।

মোটের ওপর দৃশ্যগুলি আমার হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সন্ধ্যেয় শহরে ফিরে দূরদর্শনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহিংস পথে নন্দীগ্রাম দখল নেওয়ার দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলাম। এরকম লক্ষ লক্ষ নন্দীগ্রাম গড়ে উঠবেই আর এভাবেই সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীরা হবে তার বলি। বড়ো অবাক লাগে — এ কোথায় চলেছি আমরা?

সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তন

সুজয় বসু

১

সূর্য থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে আসছে এবং জীবজগতের পক্ষে সহায়ক অবস্থা এখানে বজায় রাখছে। যতটা আসার কথা তার ৩০ শতাংশ মহাকাশে বিচ্ছুরিত হয়ে যায়, ৪৭ শতাংশ ভূপৃষ্ঠ গ্রহণ করে আবার মহাকাশে বিকিরণ করে দেয়, ২৩ শতাংশ এই গ্রহেরই জলচক্রকে চলমান রাখে। বৎসরে ৫ লক্ষ ঘন কিলোমিটার জল বাষ্প ও মেঘ হয়ে স্থলভাগের প্রায় সর্বত্র জলের সরবরাহ অব্যাহত রাখে। এই বিশাল পরিমাণ সৌরশক্তির এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই আধুনিক জীবনযাত্রার দাবি মেটাতে পারে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রায় সবটাই মাটির ২০ কিলোমিটারের মধ্যে। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং অতি সামান্য পরিমাণ অন্যান্য গ্যাস — কিছু প্রাকৃতিক কিছু মানুষের তৈরি — নিয়েই বায়ুমণ্ডল। শুধুমাত্র জীবজগতের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য যে বাতাস দরকার তা নয়। এই পৃথিবীতে সহনযোগ্য উষ্ণতা বজায় রাখার জন্য বায়ুমণ্ডলের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বায়ুর উপাদানের মধ্যে কয়েকটি পৃথিবী থেকে মহাকাশে তাপ বিকিরণে বাধা দেয়। ফলে সবটা না বেরোনোয় এই গ্রহে জীবজগতের পক্ষে প্রয়োজনীয় উষ্ণতা বজায় থাকে। এই বিশেষ গ্যাসগুলি, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে গ্রীনহাউস গ্যাস (সংক্ষেপে GHG), না থাকলে তাপমাত্রা বর্তমানের তুলনায় ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম হত। এতে জীবকূলের প্রাণরক্ষাই প্রায় অসম্ভব হত। এই বিশেষ তাপ নিরোধক গ্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হল কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2)। এছাড়া রয়েছে মিথেন (CH_4), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) ও শিল্পের ব্যবহারের প্রয়োজনে মানুষের তৈরি কয়েকটি গ্যাস। বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসগুলির পরিমাণ বাড়লে এই গ্রহের উষ্ণতা বাড়ে, কমলে কমে। উষ্ণতা বৃদ্ধির ক্ষমতাও এক একটি গ্যাসের এক এক রকম। পৃথিবী জুড়েই তাপমাত্রা মাপবার ব্যবস্থা আবহাওয়াতত্ত্ববিদেরা করেছেন। ফলে দিন-মাস-বৎসরের গড় তাপমাত্রার হিসেবটা সঠিকভাবে রাখবার ব্যবস্থা চালু আছে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে। বার্ষিক তাপমাত্রা এক থাকে না, অল্প খানিকটা ওঠানামা করে, বিভিন্ন কারণেই এই রকম হয়। কিন্তু ইদানীংকালে এই তাপমাত্রার উর্ধমুখিতা বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার (World Meteorological Organization, সংক্ষেপে WMO) বিশেষজ্ঞদের দুঃশ্চিন্তার কারণ হয় এবং ১৯৮০র দশকেই রাষ্ট্রসংঘ পরিবেশ প্রকল্প (United Nations Environment Program, সংক্ষেপে UNEP)-এর সহযোগীদের সঙ্গে দু'দফা বৈঠকের পর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় যৌথভাবে বিষয়টি উত্থাপন করেন ১৯৮৭ সালে। উষ্ণতাবৃদ্ধির জন্য ব্যাপক আবহাওয়া পরিবর্তন ও তার সম্ভাব্য বিপদ সদস্যদের অবিলম্বে এই সম্পর্কে অনুসন্ধান ও ব্যবস্থাদি নেবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বিশারদ সমিতি গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়। পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯৮৮ সালে জন্ম নেয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় আবহাওয়া পরিবর্তন বিশারদ সংস্থা (Intergovernmental Panel on Climate Change, সংক্ষেপে IPCC)। সংস্থাটি তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে এই সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ, তার বিশ্লেষণ ও অবাঞ্ছিত পরিবর্তনের মোকাবিলার যাবতীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রামাণ্য প্রতিবেদন প্রকাশের দায়িত্ব নেয়। প্রথম শাখা বা Working Group I-এর অনুসন্ধানের বিষয় আবহাওয়া পরিবর্তনের বিজ্ঞান, Working Group II বা দ্বিতীয় শাখার বিষয় এর ফলাফল, খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন এবং অসমর্থতা, Working Group III বা তৃতীয় শাখার বিষয় আবহাওয়া পরিবর্তনের উপশম করা।

আবহাওয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণারত যে সব বিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী তাঁদের সমবেত সাবধানবানী অনতিবিলম্বেই এই ভৌত বিজ্ঞানের বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আঙিনায় নিয়ে আসে। ১৯৯২-এ রিও ডি জ্যানিরোর রাষ্ট্রসঙ্ঘ আয়োজিত পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ধরিত্রী সম্মেলনের আয়োজনকালেই গঠিত হয় রাষ্ট্রসঙ্ঘের আবহাওয়া পরিবর্তন নির্মিতি সমিতি (UN Framework Convention on Climate Change, সংক্ষেপে UNFCCC)। ধরিত্রী সম্মেলনে আগত রাষ্ট্রনেতারা এই সমিতিতে অন্তর্ভুক্তির সম্মতিজ্ঞাপক সই দিয়ে একে একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক মর্যাদা দেন। ঠিক হয় প্রাথমিক প্রস্তুতির জন্য তিন বৎসর সময় দিয়ে ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতি বৎসর বিশ্বের সব দেশের প্রতিনিধিরা একটি আলোচনা সভায় বিষয়টির পর্যালোচনা করে উপযুক্ত করণীয় পদক্ষেপগুলি স্থির করবেন। এই সভার নাম দেওয়া হয় কনফারেন্স অব পার্টিজ (Conference of Parties, সংক্ষেপে COP)। প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয় বার্লিনে। এই সভাতেই গ্রহণীয় ব্যবস্থাদি বলবৎ করার জন্য এক নির্দেশনামা (Berlin Mandate) প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৯৬-এ জেনিভায় দ্বিতীয় সভাতে আলোচনায় বিরুদ্ধ মত প্রকাশ পেলেও নির্দেশনামা গৃহীত হবার অনুকূলেই সম্মতির পরিবেশ তৈরি হয়। ১৯৯৭-এ জাপানের কিয়োতো শহরের আলোচনা সভাই এক ইতিবাচক অধ্যায়ের সূচনা করে। নানা তর্ক-বিতর্কের পর এই সভাতেই গৃহীত হয় 'কিয়োতো নিয়মবিধি' বা Kyoto Protocol. IPCC ইতিমধ্যে ১৯৯২ ও ১৯৯৬-তে প্রকাশিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিবেদনে উষ্ণতাবৃদ্ধির কারণ হিসেবে গ্রীনহাউস গ্যাসের অধিক নিঃসরণকে চিহ্নিত করেছে এবং এই অনভিপ্রেত অবস্থার জন্য যে মনুষ্যকূলের ক্রিয়াকর্ম (অধিক শক্তির জন্য অধিক জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার)-ই অনেকাংশে দায়ী তা-ও উল্লেখ করেছে। কিয়োতো নিয়মবিধিতে এই যথেচ্ছ শক্তি ও জ্বালানি ব্যবহারে রাশ টানার নির্দেশ রয়েছে। শিল্পোন্নত ৩৯টি তালিকাভুক্ত দেশের ক্ষেত্রে গ্রীনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ নির্দিষ্ট পরিমাণে কমাতে হবে — ১৯৯০ সালের নিঃসরণের তুলনায় ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের গড় নিঃসরণ কমিয়ে আনতে হবে কমপক্ষে পাঁচ শতাংশ। এই নিয়মবিধিতে সই করে আমেরিকা সহ পৃথিবীর ১৬০টিরও বেশি দেশ। পদক্ষেপটি নিশ্চিতই ঐতিহাসিক। শান্তিকালীন পৃথিবীতে কোনো বৈজ্ঞানিক বিষয় ইতিপূর্বে এত দ্রুত বিশ্বরাজনীতিতে উঠে আসে নি। কিয়োতো নিয়মবিধির দুটি ধারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হল স্বাক্ষরকারী দেশগুলির ৫৫

শতাংশ, যার মধ্যে তালিকাভুক্ত দেশও থাকবে, নিজ নিজ দেশে নিয়মবিধির সরকারি অনুমোদন দিলে (ratify করলে) এবং এই দেশগুলির সমষ্টিগত নিঃসরণ ১৯৯০ সালের পৃথিবীর মোট নিঃসরণের ৫৫ শতাংশ বা তার বেশি হলে কিয়োতো নিয়মাবিধি আন্তর্জাতিক আইন হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ কোন দেশ নিয়মবিধি অগ্রাহ্য করলে বা ভঙ্গ করলে তাকে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারালয় (International Court of Justice)-এ সোপর্দ করা যাবে। একে একে বিভিন্ন দেশের সরকারি অনুমোদন আসে। ২০০০ সালে জর্জ বুশ আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েই কিয়োতো উদ্যোগ থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। অস্ট্রেলিয়া অনুগামী হয়। অবশেষে রাশিয়ার অনুমোদনের বলে ২০০৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কিয়োতো নিয়মবিধি আইন হিসেবে বলবৎ হবার মর্যাদা অর্জন করেছে। দ্বিতীয় ধারাটিতে বাজার চলতি এক আর্থিক ব্যবস্থার উপাদান রয়েছে যাতে বাজারের দর ওঠানামার বিষয়টিও স্থান পেয়েছে। কোন শিল্পোন্নত (তালিকাভুক্ত) দেশ যদি তার নিঃসরণ নিয়মবিধির নির্দেশিত মাত্রায় কমাতে সক্ষম না হয় এবং অন্য কোন তালিকা বহির্ভুত দেশ, সাধারণভাবে তৃতীয় বিশ্বের, উপযুক্ত ব্যবস্থাদি নিয়ে নিঃসরণ কমিয়ে আনতে পারে, তাহলে তালিকাভুক্ত প্রথম দেশটির ঘাটতি দ্বিতীয় দেশটির নিঃসরণ হ্রাসের পরিমাণ দিয়ে মেটাতে পারে। অবশ্যই অর্থের বিনিময়ে। নিয়মবিধিতে ব্যবস্থাটির নাম 'পরিচ্ছন্ন উন্নয়ন প্রক্রিয়া' বা Clean Development Mechanism, সংক্ষেপে CDM। এবং নিঃসরণ হ্রাস 'কার্বন ঋণ' বা carbon credit যার একক এক টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা তার সমতুল বিশ্ববাজারে ক্রয়যোগ্য পণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে — চাহিদা অনুযায়ী দাম ওঠানামাও হবে। গ্রীনহাউস গ্যাস হিসেবে মিথেন কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় ২১ গুণ শক্তিশালী হওয়ায় ১ টন মিথেনকে ২১ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সমতুল ধরতে হবে। কিয়োতো নিয়মবিধিতে যে ৬টি গ্যাসকে গ্রীনহাউস গ্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলি হল : (১) কার্বন-ডাই-অক্সাইড CO_2; (২) মিথেন CH_4; (৩) নাইট্রাস অক্সাইড N_2O; (৪) হাইড্রো ক্লোরোফ্লুরো কার্বন HCFC; (৫) পারফ্লুরো কার্বন PFC ও (৬) সালফার হেক্সাফ্লোরাইড SF_6। পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির মোকাবিলায় এই গ্যাসগুলির নিঃসরণের পরিমাণ অবশ্যই কমিয়ে আনতে হবে।

আবহাওয়া পরিবর্তনের নেতিবাচক ফলগুলিই অধিক জোরালো। উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য বৃষ্টিপাতের ধারার পরিবর্তন হবে, এতাবৎ বৃষ্টিনির্ভর স্বাভাবিক সেচে যে পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হত তা হবে না। কম সময়ে অধিক বৃষ্টি হলে বন্যা হবে। সেই বন্যার জল নদীবাহিত হয়ে সমুদ্রের নোনা জলের সঙ্গে মিশবে — স্বাদু জলের অভাব হবে। ঝড় ঝঞ্ঝার সংখ্যা ও তীব্রতা বাড়বে। তাপমাত্রা বাড়লে সমুদ্রের জলের প্রসারণ ঘটবে এবং হিমবাহগুলির ও মেরু অঞ্চলের বরফগলা জল সমুদ্রে এসে জলতলকে উপরে তুলবে। ছোটো ছোটো দ্বীপ ও সমুদ্র তীরবর্তী নিম্নাঞ্চলগুলি প্লাবিত হয়ে বহু জনপদকে ধ্বংস করবে। ব্যাপক জন-অপসারণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। উষ্ণতা বাড়লে পোকামাকড়ের হাত থেকে সাধারণভাবে উত্তর অক্ষাংশের শীত প্রধান অঞ্চলও রেহাই পাবে না। কীটপতঙ্গ যেমন মশা-মাছি বাহিত রোগের সংক্রমণ বাড়বে। খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সমস্যায় দরিদ্র দেশগুলি জর্জরিত। তাদের সংকট আরো গভীর হবে। আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির মোকাবিলায় খরচ হবে বছরে ৩০ হাজার কোটি ডলারেরও বেশি — এ হিসেব UNEP'র ভূতপূর্ব কর্মাধ্যক্ষ ডঃ ক্লাউস টোয়েফারের। তিনি বলেছেন দরিদ্র দেশগুলির কোন কোনটিকে তাদের জাতীয় আয়ের ১০ শতাংশ অবধি ব্যয় করতে হতে পারে এই সব কারণে। পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক এতে সন্দেহ নেই।

অতি সম্প্রতি IPCC তার সর্বশেষ প্রতিবেদনের সারাংশ নীতি প্রণয়নকারীদের প্রয়োজনে প্রকাশ করেছে। সমগ্র প্রতিবেদন, এটি চতুর্থ, জনসাধারণের কাছে পৌঁছতে আরো কয়েকমাস সময় লাগবে। সারাংশ যা আছে সেটাই বিজ্ঞানী সম্প্রদায়কে ছাপিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও এক গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। প্রচারমাধ্যমগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই আবহাওয়া পরিবর্তন ও পৃথিবীর উষ্ণতাবৃদ্ধির বিষয়টিকে জনসমক্ষে হাজির করছেন।

IPCC'র প্রথম তিনটি নির্ধারণ প্রতিবেদন বা Assessment Report সংক্ষেপে AR প্রকাশিত হয় ১৯৯২, ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালে। প্রথম প্রতিবেদনে উষ্ণতাবৃদ্ধির কথা বলা হলেও আনুমানিক কতটা বাড়বে কতদিনে, তা উহ্য রাখা হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রতিবেদনে আরও তথ্যাদি সংগ্রহ করে এবং গাণিতিক নক্শার সাহায্যে বিশ্লেষণ করে ২১০০ সালে তাপমাত্রা কতটা বাড়তে পারে তার একটা আন্দাজ দেওয়া হয় — বৃদ্ধি ঘটবে ১ ডিগ্রি থেকে ৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ভিতরে। প্রাকৃতিক ও অন্যান্য পরিবর্তনেরও উল্লেখ করা হয়। পাঁচ বৎসরের পর ২০০১ সালের তৃতীয় প্রতিবেদনে আরও বিচার বিশ্লেষণের পর ওই ২১০০ সালের তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণকে সংশোধন করা হয় — আরও অধিক বৃদ্ধি ঘটবে তাপমাত্রার। বিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ১৯০১ সাল থেকে ২০০০ সাল অবধি গড় তাপমাত্রা বেড়েছে মাত্র ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রথম অর্ধে তাপমাত্রা একটু কমেছিল, দ্বিতীয় অর্ধে ধারাবাহিকভাবেই প্রায় বেড়েছে। ১৯৭০-এর দশকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ছিল ১৪.০২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ১৯৮০-র দশকে সেটা বেড়ে হয় ১৪.২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, এবং ১৯৯০-এর দশকে আরও বেড়ে দাঁড়ায় ১৪.৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই দশকের ১৯৯৮ তে গড় তাপমাত্রা ১৪.৭১ ডিগ্রি ছুঁয়ে গত একহাজার বৎসরের মধ্যে উষ্ণতম বৎসরের স্বীকৃতি পায়। তৃতীয় প্রতিবেদনে এই বৃদ্ধির হারকে গত দেড় লক্ষ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং আগামী এক শতাব্দীতে বৃদ্ধির পরিমাণ ১.৪ ডিগ্রি থেকে ৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস অবধি হতে পারে ঘোষণা করে।

উষ্ণতা বৃদ্ধির বিষয়টি বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণের তাত্ত্বিক স্তরকে ইতিমধ্যে অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার আওতায় এসেছে। শীত তেমন পড়ছে না। কোথাও খরায় ফসল মার খাচ্ছে, কোথাও অকালে বৃষ্টি এসে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর আগে সময়ের নিয়মিত চক্রে ঋতুগুলি যেভাবে আবর্তিত হত তা হচ্ছে না। শীত ক্রমশঃ পিছিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এই অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন জীবনযাত্রায় কোন বড়ো রকমের ছাপ এখনই ফেলছে না। উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ যদি গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া হয়, বিজ্ঞানীরা তাই-ই বলছেন, তাহলে নিঃসরণ কমানোর জোরালো ব্যবস্থাদি আশু নেওয়া হচ্ছে না কেন? সরকারি তরফেও এই নিয়ে কোন গভীর দুশ্চিন্তার ছায়া কোথাও দেখা যাচ্ছে না। অথচ তাপমাত্রা বাড়ছেই। ২০০৫ সাল ১৯৯৮-এর রেকর্ড ভেঙেছে। উষ্ণতার ভিত্তিতে বৎসরগুলির ক্রম অবস্থান এখন :

২০০৫ –১৯৯৮–২০০২–২০০৩–২০০৪–২০০১। অর্থাৎ নতুন শতাব্দীর প্রথম পাঁচটি বৎসরই উষ্ণ-তালিকায় রয়েছে। কী হবে এই শতাব্দীর শেষপ্রান্তে?

২

আন্তঃরাষ্ট্রীয় আবহাওয়া পরিবর্তন বিশারদ সংস্থা (IPCC) এই বৎসরের গোড়াতেই চতুর্থ নির্ধারণ প্রতিবেদন (Assessment Report 4, সংক্ষেপে AR4) প্রকাশ শুরু করেছে। প্রথম শাখা বা WG-I এর প্রতিবেদনের নীতিপ্রণয়নকারীদের জন্য সারাংশ প্রকাশিত হয় প্যারিস থেকে ফেব্রুয়ারির ২ তারিখে। ১৮ পৃষ্ঠার এই প্রতিবেদনে আবহাওয়া পরিবর্তনের (ভৌত) বিজ্ঞান ভিত্তিই (Physical Science Basis) আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় শাখা বা WG-II অনুরূপ সারাংশ প্রকাশ করে ব্রাসেলস-এ এপ্রিলের ৬ তারিখে — ২২ পৃষ্ঠার এই প্রতিবেদনে রয়েছে প্রভাব, অভিযোজন ও অসমর্থতা (Impacts, Adaptation and Vulnerability) সংক্রান্ত তথ্যাদি। তৃতীয় শাখা বা WG-III ব্যাঙ্ককে পাঁচদিন আলোচনার পর ৪ঠা মে ৩৬ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন সারাংশ প্রকাশ করে। আবহাওয়া পরিবর্তন উপশম (Mitigation of Climate Change) নিয়ে এই প্রতিবেদনের খসড়ার ওপর কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত আলোচনা হয়, তার কারণ উপশম পদ্ধতিগুলির কার্যকরী রূপ দেবার দায়িত্ব সরকারের (প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক নেতাদের)। নিঃসরণ কমানোর জোরালো সুপারিশ এই ব্যক্তিবর্গকে অসুবিধায় ফেলতে পারে। তৃতীয় শাখায় বিজ্ঞানী ছাড়াও অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, রাজনীতিকরাও আছেন এবং রাজনীতিক বিরোধীরা বিজ্ঞানীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এই প্রতিবেদন সারাংশে সুপারিশগুলির ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্যের দৃঢ়তাকে কমিয়ে আনতে বাধ্য করেন। এতদসত্ত্বেও যা প্রকাশিত হয়েছে তা উদাসীন রাজনীতিক/রাষ্ট্রনেতাদের উপশম সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলির প্রতি মনোযোগী করে তুলবে আশা করা যায়।

চতুর্থ প্রতিবেদনের বিস্তৃত বিবরণাদি আর কয়েকমাসের মধ্যেই প্রকাশিত হবে। ইতিমধ্যেই সারাংশ তিনটি নিয়ে বিশ্বজুড়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। সরকারের বাইরে যাঁরা আছেন তাঁদের অধিকাংশের অভিমত গুরুতর বিপদ আসন্ন জেনেও উন্নত কয়েকটি দেশ ছাড়া কোথাও তেমন কোনও জোরালো কর্মসূচী নেওয়া এবং বাস্তবে তার যথার্থ অনুসরণ করা হচ্ছে না। তাঁরা পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধিজনিত সংকটগুলির মোকাবিলায় এখনই ব্যবস্থাদি নেওয়ার জন্য সরকারকে চাপ দিতে জনমত গঠনের প্রতি জোর দিচ্ছেন। সমর্থনে তাঁরা প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যই পেশ করছেন :

● গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমছে না, বেড়ে চলেছে : ২০০০ সালে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল লক্ষে ৩৬.৫ ভাগ, ২০০৫-এ এটা দাঁড়িয়েছে লক্ষে ৩৭.৯ ভাগ। ১৯৯০-এর দশকে বাতাসে কার্বন নির্গত হত বৎসরে ৬৪০ কোটি টনের মতো। ২০০০ থেকে ২০০৫-এ এর পরিমাণ বেড়ে হয়েছে বৎসরে ৭২০ কোটি টন। এই বৃদ্ধি মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের ক্ষেত্রে এতটা নয়। কিন্তু যা প্রতিটি গ্যাসের ক্ষেত্রে ঘটছে তা গত ৬,৫০,০০০ বৎসরের মধ্যে ঘটেনি — বাতাসে এ গ্যাসগুলির এতটা উপস্থিতি এই দীর্ঘ সময় — সাড়ে ছ'লক্ষ বৎসর — ধরে ছিল না। শিল্পযুগে এসে মানুষ এক অনন্য, অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটিয়েছে যেটা সর্বাংশে তার নিরাপত্তা, তার অস্তিত্বের পরিপন্থী।

[কী করে হদিস পেলেন বিজ্ঞানীরা এত দীর্ঘ সময়ের বায়ুমণ্ডলের উপাদানের? মেরু অঞ্চলে গত বৎসরের বরফ চাপা পড়ছে এই বৎসরের ঝরঝরে বরফের নীচে। গত বৎসরের স্তরের নীচে আছে আগের আগের বৎসরের স্তরগুলি। যত নীচের বরফ তত বেশি তার বয়স। বিজ্ঞানীরা কুমেরুতে নীচ থেকে বরফ তুলে এনে এই পরীক্ষা চালিয়েছেন গত আট বৎসর ধরে। ৩৭২০ মিটার ড্রিল করার পর পাথরে ঠেকেছে। শেষ স্তরের বয়স ৮,৯০,০০০ বৎসর। বরফে আটকে পড়া বাতাসের বুদবুদগুলি বিশ্লেষণ করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাসের পরিমাণ নির্ণয় করা গেছে, দেখা গেছে বিভিন্ন যুগে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ধীরে ধীরে বেড়ে আবার কমে এসেছে। গত সাড়ে ছ'লক্ষ বৎসরে ওঠানামা করেছে লক্ষে ১৮ ভাগ থেকে ৩০ ভাগ। বিজ্ঞানীরা বরফগলা জলে হাইড্রোজেন অনু ও সমস্থানিক (isotope) ডয়টেরিয়াম অনুর অনুপাত থেকে তাপমাত্রা মাপবার একটি বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন যুগে তাপমাত্রার পরিবর্তনও বের করেছেন। দেখা যাচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ার সঙ্গে একযোগে তাপমাত্রা বেড়েছে এবং কমে গেলে কমেছে। পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ছে গ্রীন হাউস গ্যাসের বৃদ্ধির কারণে এ বিষয়ে আর সংশয়ের অবকাশ থাকছে না। বর্তমানে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির হার বৎসরে লক্ষে ০.১৯ ভাগ। এই হারে বাড়লে অদূর ভবিষ্যতে উষ্ণতা বৃদ্ধির ওপর কোন নিয়ন্ত্রণই রইবে না। সার্বিক ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে।]

● তাপমাত্রা বৃদ্ধি হচ্ছে, হবেও। তৃতীয় প্রতিবেদনে ২১০০ সালে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ২০০০ সালের তুলনায় ১.৪ ডিগ্রি থেকে ৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি হবে এমনই অনুমান করা হয়েছিল। চতুর্থ প্রতিবেদনে সংশোধন করে বৃদ্ধি ১.১ ডিগ্রি থেকে ৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কথা বলা হয়েছে। মাঝামাঝি ৩ ডিগ্রি ধরলেও অবস্থা যথেষ্ট সঙ্গীন নির্দ্বিধায় বলা যায়।

আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাব এশিয়া মহাদেশে কী হবে সেই প্রসঙ্গে চতুর্থ প্রতিবেদনে রয়েছে :

⇨ হিমালয়ের হিমবাহগুলি গলে গিয়ে বন্যা এবং শিলাপ্রপাত(rock avalanches) ঘটাবে, দু'তিন দশক ধরে জলসম্পদে এর প্রভাব পড়বে, তারপর থেকে হিমবাহগুলি পিছনে সরে যাওয়ার জন্য নদীতে জল কমতে থাকবে।

⇨ মধ্য, দক্ষিণ, পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়, বিশেষ করে নদী অববাহিকাগুলিতে জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতির কারণে ২০৫০ থেকেই স্বাদু জলের অভাবে ভুগবে ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ।

⇨ উপকূল অঞ্চলে, বিশেষ করে অতি জনবহুল নদী ব-দ্বীপগুলি, সব থেকে ক্ষতিপ্রবণ হবে সমুদ্র থেকে বন্যায় এবং কিছু কিছু ব-দ্বীপে নদী-বন্যায়।

⇨ দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগরায়নের চাপে বেশ কতকগুলি দেশে খাদ্যাভাবের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

⇨ শুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, খরা ও বন্যা উভয় কারণেই, পূর্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আন্ত্রিক রোগের বিস্তার ঘটাবে। তাপমাত্রা বাড়ায় সমুদ্র উপকূলের জলে অধিক দূষণ মারাত্মক কলেরা রোগের মহামারী আকার দেবে দক্ষিণ এশিয়ায়।

⇨ আবহাওয়া পরিবর্তন এশিয়ার অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে পোষণযোগ্য উন্নয়নকে ব্যাহত করবে। কারণ দ্রুত নগরায়ন, শিল্পায়ন ও আর্থিক উন্নয়ন প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের ওপর চাপ বাড়িয়ে তুলবে।

মোট কথা চতুর্থ প্রতিবেদন যে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে তা তৃতীয় প্রতিবেদনের ভয়াবহতাকে ম্লান করছে। তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে কারণ বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাস (প্রধানত কার্বন–ডাই–অক্সাইড)–এর পরিমাণ বৃদ্ধি। উষ্ণতা বৃদ্ধিতে কার্বন–ডাই–অক্সাইডের অবদান ৬৪ শতাংশ। বায়ুমন্ডলে এই গ্যাসের অবস্থিতিকাল (residence time)-ও দীর্ঘ — ৫০ থেকে ২০০ বৎসর। তুলনায় মিথেনের অবস্থিতিকাল মাত্র ১২ বৎসর ও নাইট্রাস অক্সাইডের ১২০ বৎসর। অর্থাৎ এখন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে কার্বন–ডাই–অক্সাইড নিঃসৃত হচ্ছে আগামী শতাব্দীর শেষ অবধি তার প্রভাব থাকবে। শিল্প, কৃষিতে আরও অধিক শক্তির চাহিদা মেটাতে, পরিবহণে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধিতে, গৃহস্থালীতে আরও বেশি করে জীবাশ্ম জ্বালানি — তেল, কয়লা, গ্যাস — পোড়ানো হচ্ছে এবং শক্তি ব্যবহার প্রতি বৎসরই বাড়ছে। ফলে ১৯৯০–এর দশকে যেখানে বৎসরে এই গ্যাস নিঃসৃত হত ২৩৫০ কোটি টন, ২০০০ থেকে ২০০৫ এই সময়ে সেটা বেড়ে হয়েছে ২৬৪০ কোটি টন। গাছপালা বাতাস থেকে কার্বন–ডাই–অক্সাইড নিয়ে খাদ্য তৈরি করে। বনাঞ্চল ধ্বংস করায় কার্বন–ডাই–অক্সাইড নেওয়ার দিকটা ক্রমেই কমছে। সাগরের জল কার্বন–ডাই–অক্সাইডের অনেকটাই শোষণ বা ধারণ করে, তাপমাত্রা বাড়লে এর পরিমাণ কমে। আরও তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যে মহাসাগরগুলি শোষণ না করে কার্বন–ডাই–অক্সাইড বাতাসে ছাড়বে অর্থাৎ আধারের পরিবর্তে উৎসের ভূমিকা নেবে। ফলে তাপমাত্রা আরও বাড়বে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন–ডাই–অক্সাইডের পরিমাণ আবার বাড়বে এবং এই পারস্পরিক সহযোগিতা এক গভীর বিপদের সৃষ্টি করবে যার মোকাবিলা করবার সাধ্য মানুষের নেই। বিজ্ঞানীরা বেশ কিছুকাল ধরেই সতর্ক করে চলছেন উষ্ণতাবৃদ্ধির এই ক্রান্তিবিন্দু সম্বন্ধে, যেখানে গেলে মানুষের আর আবহাওয়ার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণই থাকবে না। সাধারণভাবে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসই বৃদ্ধির সেই চূড়ান্ত মাত্রা হিসেবে নেওয়া হয়। চতুর্থ প্রতিবেদনে কিন্তু এই শতাব্দীতে সবচেয়ে সম্ভাব্য বৃদ্ধি এই ৩ ডিগ্রিই চিহ্নিত করা হয়েছে।

কার্বন–ডাই–অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ

দেশ	জনসংখ্যা (কোটি)	বাৎসরিক নিঃসরণ (কোটি টন)	মাথাপিছু বাৎসরিক নিঃসরণ (টন)
ভারত	১০৭.৯৭	১১০.২৮	১.০২
চীন	১২৯.৬১	৪৭৩.২৩	৩.৬৫
জাপান	১২.৭৬৯	১২১.৫	৯.৫২
ইটালি	৫.৮১৩	৪৬.২৩	৭.৫৯
ফ্রান্স	৬.২১৮	৩৮.৬৯	৬.২২
জার্মানি	৮.২৫	৮৪.৮৬	১০.২৯
নরওয়ে	০.৪৫৯	৩.৬৩	৭.৯১
ইউ কে	৫.৯৮৪	৫৩.৭১	৮.৯৮
কানাডা	৩.১৯৫	৫৫.০৯	১৭.২৪
ইউ এস এ	২৩.৯৯	৫৮০	১৯.৭৩
সারা পৃথিবী	৬৩৫.২	২৬৫৮.৩	৪.১৮

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি, ২০০৬

পরিস্থিতি নিশ্চিতই গম্ভীর। উপশমের ব্যবস্থাদি জরুরি ভিত্তিতে চালু করা প্রয়োজন। গ্রীনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমাতে হবে ও শোষণ ব্যবস্থা — বনসৃজনই শ্রেষ্ঠ উপায় — বাড়াতে হবে। IPCC'র তৃতীয় শাখা উপশমের জন্য ৭টি ক্ষেত্রে করণীয়গুলির নির্দেশ দিয়েছে। ক্ষেত্রগুলি হল : ১) শক্তি সরবরাহ, ২) পরিবহণ, ৩) ইমারত, ৪) শিল্প, ৫) কৃষি, ৬) বনাঞ্চল, ও ৭) বর্জ্য। প্রথম পাঁচটি ক্ষেত্রেই উন্নত দক্ষতা ও অপচয় হ্রাসের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বনসৃজন ও সংরক্ষণ এবং বনজ দ্রব্য থেকে তরল জ্বালানি উৎপাদনের বিশেষ উল্লেখ রয়েছে। বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার, সংক্ষেপন ও শক্তিতে রূপান্তর নির্দেশিত হয়েছে। জীবাশ্ম জ্বালানি বর্তমানে পৃথিবীতে ব্যবহৃত বাণিজ্যিক শক্তির ৮০ শতাংশের বেশি চাহিদা মেটায়। সৌরশক্তি প্রকৃতপক্ষেই পরিচ্ছন্ন এবং এই শক্তি ব্যবহারের ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমেই জীবাশ্ম জ্বালানির চাহিদা কমানো সম্ভব। নব্য সৌরপ্রযুক্তির প্রসারে ভাল বিনিয়োগের প্রয়োজন। তৃতীয় বিশ্বে সেটা সমস্যা হলেও শিল্পোন্নত ধনী দেশে নয়। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও জনচেতনা বাড়িয়েই অনেকটা এগোনো যায়।

কিয়োতো নিয়মবিধিতে গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ওপর বাধ্যবাধকতা চালু হবার পর থেকেই আমেরিকা ফ্রান্স ও জাপানে পরমাণু শক্তি শিল্পে এক জোয়ার আনার চেষ্টা চলে আসছে। স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি, পরমাণু শক্তি কেন্দ্র থেকে কার্বন–ডাই–অক্সাইড বা অন্য কোন গ্যাস নিঃসৃত হয় না। আবহাওয়া পরিবর্তন বিশারদ গোষ্ঠী এই বক্তব্যে প্রভাবিত হয়নি। তৃতীয় প্রতিবেদনেই পরমাণু শক্তি সুপারিশ না করার কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল : ১) গ্যাস টারবাইন যৌথ চক্রের তুলনায় অধিক ব্যয়; ২) কেন্দ্র চলাকালীন নিরাপত্তা ও বর্জ্য সম্পর্কে জনসাধারণের বিমুখতা; ৩) তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরমাণু জ্বালানির পুনঃপ্রকরণ সংক্রান্ত নিরাপত্তা; ৪) পরমাণু জ্বালানির পরিবহণের ঝুঁকি ও ৫) পরমাণু অস্ত্রের প্রসার। চতুর্থ প্রতিবেদনে শক্তি ক্ষেত্রে সৌর ও নবীকরণযোগ্য শক্তির সঙ্গে পরমাণু শক্তির উল্লেখ আছে। কিন্তু নিরাপত্তা, অস্ত্র–সম্প্রসারণ ও বর্জ্য যে অন্তরায় এও মন্তব্য করা হয়েছে।

শক্তির ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে শক্তি সংরক্ষণ এবং ব্যবহারে দক্ষতাবৃদ্ধি। দক্ষতা বাড়াতে পারলে শক্তির নিরাপত্তা বাড়বে এই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ২০০৫ সালে নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে তৈরি বিদ্যুৎ মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ১৮ শতাংশ ছিল, ২০৩০ সালে এই অংশটি বেড়ে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ হতে পারে। বিপরীতে পরমাণু শক্তির বর্তমান ১৬ শতাংশ অবদান ২০৩০ সালে বেড়ে ১৮ শতাংশ হতে পারে বলা হয়েছে। এটা সুখের কথা যে বিশারদগোষ্ঠী পরমাণু শক্তির প্রতি আস্থাবান হতে পারেননি।

ভারত সরকারের তরফ থেকে চতুর্থ প্রতিবেদনের ওপর তেমন কোন মন্তব্য করা হয়নি। বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার আধিপত্য নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠেনি। সন্তোষজনক কয়লার ভাণ্ডার ও সুলভতার কারণেই ভারতে মোট উৎপন্ন বিদ্যুতের ৮২ শতাংশ আসে কয়লা জ্বালানি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন মাত্র ১৫ শতাংশ। এখান থেকে অনেকটা বাড়ানো খুব সহজ ব্যাপার নয়। খুব সম্প্রতি একটি

গবেষণাপত্রে ভারতের জলবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে প্রচুর পরিমাণ মিথেন — সারা বিশ্বের ৪ শতাংশ — নিঃসরণের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বৃহৎ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার সম্ভাবনা এদেশে কম। বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনে এই দেশে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু বড়ো মাপের সরবরাহ সংক্রান্ত কিছু জটিল সমস্যার এখনও সমাধান হয়নি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং চতুর্থ প্রতিবেদন প্রকাশের পর আবহাওয়া পরিবর্তন মোকাবিলায় এক বিশেষ কমিটি গঠন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ও বিত্তমন্ত্রী ছাড়া যোজনা পরিষদের উপ-সভাপতি মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া, সরকারের বিজ্ঞান উপদেষ্টা ডঃ চিদাম্বরম, শিল্পপতি রতন টাটা ইত্যাদি বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এই কমিটি আশা করা যায় যথাযথ পথনির্দেশ করবে। যেহেতু আন্তর্জাতিক মহলে উষ্ণতা বৃদ্ধির মোকাবিলায় পরমাণু শক্তি তেমন কোন গুরুত্ব পায়নি, ভারত-আমেরিকা পরমাণু চুক্তির গ্রহণ অথবা বর্জন যাই হোক তা উপশম ব্যবস্থাদিতে এদেশে খুব একটা তারতম্য ঘটাবে না বলেই মনে হয়।

এই মাসেই জার্মানির হাইলিগেনডাম-এ আমেরিকা-ইংলন্ড-জার্মানি-রাশিয়া-সহ ৮টি ধনী দেশের যে বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন জার্মানির রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি এঞ্জেলা মার্কেলের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হল, তাতে স্বাভাবিকভাবেই আবহাওয়া পরিবর্তন একটি আলোচ্য বিষয় ছিল। বলা বাহুল্য নির্দিষ্ট কোন মাত্রায় গ্রীনহাউস গ্যাস কমিয়ে আনার প্রস্তাবে প্রধান আপত্তি ছিল আমেরিকার, যেখানে মাথাপিছু বার্ষিক নিঃসরণের পরিমাণ ২০ টন (বিশ্বের গড় ৪ টনের মতো)। নানা যুক্তি-তর্ক অনুরোধ-উপরোধের পর সম্মেলন সভাপতি এক বিবৃতিতে ২০৫০ সালে এই দেশগুলিতে নিঃসরণ বর্তমানের তুলনায় ৫০ শতাংশে কমিয়ে আনার এক সমঝোতা-সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। প্রতিশ্রুতি কতটা রক্ষিত হবে তা নিয়ে একটা সংশয় থাকছে। তৃতীয় বিশ্ব থেকে কোন সিদ্ধান্তের কথা শোনা যায়নি। অবশ্য এত শীঘ্র এই দেশগুলি থেকে প্রতিক্রিয়া আশাও করা যায় না। অথচ অবধারিতভাবেই এই দেশগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে সব থেকে বেশি। অনেকেই মনে করেন সমস্যাগুলির সমাধান শুধুমাত্র বিজ্ঞান প্রযুক্তির ওপর চাপানো সমীচীন হবে না। সামাজিকভাবে, এমনকি ব্যক্তিগত পর্যায়েও এর মোকাবিলা না করলেও নয়। জীবনযাত্রার ধরন পালটানো দরকার। শক্তির যথেচ্ছ ব্যবহারের যে রীতিতে আধুনিক জীবন আসক্ত হয়েছে তা থেকে দূরে সরে আসতে হবে। প্রয়োজন শক্তি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার ব্যাপক পরিবর্তন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সার্বিক বিপদ থেকে বাঁচাতে শক্তিকে মহার্ঘ মেনে নিয়েই ব্যবহার করতে হবে। প্রাকৃতিক শক্তিকে গুরুত্ব মানবগোষ্ঠী চিরকাল দিয়েছে। শিল্পযুগের বিচ্যুতির পর প্রকৃতির সঙ্গে সুস্থ সমন্বয়কে অগ্রাধিকার দিয়েই বাঁচবার শিক্ষা নিতে হবে। মানুষের ক্রমমুক্তির এই একটি পথই আজ রয়েছে।

পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির সমস্যায়
পরমাণু বিদ্যুৎ কোন সমাধানই নয়

হেলেন ক্যালডিকট

হেলেন ক্যালডিকট-এর বই Nuclear Power Is Not The Answer To Global Warming Or Anything Else-এর প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে সম্পাদনা করে অনুবাদ করেছেন শমীক সরকার।

পরিহাসের ব্যাপার, বুশ প্রশাসন একদিকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধিকে বিপদ হিসেবে স্বীকার করতেই নারাজ। অন্যদিকে সেই গ্লোবাল ওয়ার্মিংকেই অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে পরমাণু বিদ্যুতের পক্ষে সওয়াল করতেও তারা ছাড়ছে না। উপরাষ্ট্রপতি ডিক চেনি বলেছেন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ৫০% দায় বাতাসে বর্দ্ধিত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণের এবং পরমাণু বিদ্যুতে কোন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ হয় না। আমেরিকার নিউক্লিয়ার এনার্জি ইন্সটিটিউট (NEI) বড়ো বড়ো সংবাদপত্রে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন দিয়ে বলছে, 'আমাদের ১০৩টি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র কিছুই পোড়ায় না, তাই তারা কোনো গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করে না।' পরমাণু ব্যবসায়ীদের কাছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং আশীর্বাদ স্বরূপ।

এসবই ভুল কথা। যদিও পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র সরাসরি কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ করে না, কিন্তু পরমাণু ব্যবসার সঙ্গে জড়িত যে বিপুল এবং জটিল খনন, পরিকাঠামো নির্মাণ প্রভৃতি, যাকে পরিভাষায় বলে পরমাণু জ্বালানি চক্র (nuclear fuel cycle), তাতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সহ অন্যান্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর জন্য দায়ী গ্যাস নিঃসৃত হয় বিপুল পরিমাণে, কারণ তাতে জীবাশ্ম জ্বালানিই ব্যবহার করা হয়।

একটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আয়ুষ্কালে, তার কতটা শক্তি লাগে, আর কতটা শক্তি সে উৎপাদন করে, এ নিয়ে গবেষণা খুবই কম হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অন্যতম সেরা গবেষণা ২০০৪ সালে প্রকাশিত জান উইলিয়াম স্টর্ম ভ্যান লিউয়েন এবং ফিলিপ স্মিথ-এর 'পরমাণু বিদ্যুৎ — শক্তি ভারসাম্য।'* নীচের হিসেবগুলি বেশিরভাগ এই গবেষণাপত্র থেকে নেওয়া।

পরমাণু জ্বালানি চক্রের প্রথমটি হল পরমাণু বিদ্যুতের খনিজ ইউরেনিয়ামের খনন এবং নিষ্কাশন। ইউরেনিয়াম থাকে আকরিক অবস্থায়। পাথুরে আকরিক খননে এবং পরিবহণে বিপুল জীবাশ্ম জ্বালানি খরচ হয়। সেই পাথরকে মিহি করে গুঁড়ো করতে হয়, আবার, জীবাশ্ম জ্বালানি খরচ করে। সেই গুঁড়োকে সালফিউরিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য রাসায়নিকে মেশাতে হয়। এই প্রক্রিয়াতেও তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে হয় রাসায়নিকগুলির, ফলে আবার প্রয়োজন হয় জীবাশ্ম জ্বালানির। ইউরেনিয়ামের আকরিক হতে পারে নরম বা শক্ত। নরম আকরিক হতে পারে স্যান্ডস্টোন, ক্যালস্ট্রেট প্রভৃতি, তাতে ইউরেনিয়ামের ঘনত্ব থাকে ১০ শতাংশ থেকে ০.০১ শতাংশ। প্রতি টন আকরিক নিষ্কাশনে ২৩৩ কোটি জুল শক্তি লাগে। শক্ত আকরিক

---

* *ইন্টারনেটে সম্পূর্ণ গবেষণাপত্রটি পাওয়া যায়। ঠিকানা :*
http://beheer.opvit.rug.nl/deenen/Nuclear_sustainability_rev3.doc

যেমন গ্রানাইট বা কোয়ার্টজ, যেখানে ইউরেনিয়ামের ঘনত্ব ০.১ শতাংশ থেকে ০.০০১ শতাংশ অবধি হতে পারে, তা নিষ্কাশনে টন প্রতি ৫৫০ কোটি জুল শক্তি লাগে। যদি আকরিকে ইউরেনিয়ামের ঘনত্ব ০.০১ শতাংশের কম হয়, তাহলে ঐ ইউরেনিয়াম থেকে যে পরিমান শক্তি উৎপাদিত হতে পারে, তার তুলনায় খনন ও নিষ্কাশনে শক্তি খরচ বেশি হয়। আর এ পৃথিবীতে এর চেয়ে ভালো মানের ইউরেনিয়াম, বর্তমান হারে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে থাকলে, আর ৫০ বছর চলতে পারার মতো মজুত আছে।

ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনের পরে যে আকরিকটি পড়ে থাকে, তা তেজষ্ক্রিয়, তাই সেটাকে ভালোভাবে সমাহিত করা প্রয়োজন, তার জন্য প্রয়োজন, সেই তেজষ্ক্রিয় আকরিককে লাইমস্টোন দিয়ে নিউট্রালাইজ করা। যাতে ভূগর্ভস্থ জলে তা না মেশে তার জন্য প্রয়োজন বেনটোনাইট মিশিয়ে শক্ত করা। তাকে পরিবহণ করে নিয়ে গিয়ে খনিতে ফেলা। সেই খনি ভালোভাবে বুঁজিয়ে তার উপর গাছ লাগানো। এই কাজে প্রয়োজন বিপুল শক্তি, খননে যে শক্তি খরচ হয় তার ৪ গুণ। এবং তা অবশ্যই জীবাশ্ম জ্বালানি। যার থেকে প্রচুর কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয়।

ইউরেনিয়ামকে এরপর ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লুওরাইড গ্যাসে পরিবর্তন করতে হয়, প্রয়োজনীয় ইউরেনিয়াম ২৩৫-কে আলাদা করার জন্য। এই পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন প্রতি কেজি ইউরেনিয়ামে ১৪৭.৮ জুল শক্তি।

ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর সমৃদ্ধিকরণের জন্য (অর্থাৎ ০.৭% থেকে বাড়িয়ে ৩% করার জন্য) প্রচুর শক্তি লাগে। দুই ধরনের পদ্ধতি আছে এই সমৃদ্ধিকরণের। প্রথমটা হল গ্যাসীয় ব্যাপন, দ্বিতীয়টা আল্ট্রাসেন্ট্রিফিউজ। প্রথমটায় সরাসরি শক্তি বেশি লাগে, দ্বিতীয়টির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিকাঠামোগত শক্তি খরচ বেশি। এছাড়া অতি সম্প্রতি আমেরিকার শক্তি মন্ত্রক সূত্রে জানা যাচ্ছে কেন্টাকির পাদুকার ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণ কেন্দ্রের শীতলায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জলের পাইপ লিক করে CFC 114 গ্যাস বেরোচ্ছে, যা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের থেকে ১০০০ গুণ বেশি ক্ষতিকারক গ্লোবাল ওয়ার্মিং এজেন্ট এবং যা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ওজোন স্তরকে ধ্বংস করে। [সূত্র : চেকলিক, ৮ জুন ২০০৪]

সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড গ্যাসকে এরপর সিগারেটের ফিল্টারের আয়তনের কঠিন ইউরেনিয়াম অক্সাইডের রডে পরিণত করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায়ও জীবাশ্ম জ্বালানি প্রয়োজন হয়, প্রতি টন ইউরেনিয়ামে ৩৭৯০ কোটি জুলের মতো শক্তি খরচ হয় এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়।

পরমাণু চুল্লি তৈরি করতেও প্রয়োজন বিপুল জীবাশ্ম জ্বালানি। চুল্লি পিছু শক্তি খরচের পরিমাণ গড়ে ৮০,০০০ লক্ষ কোটি জুলের মতো।

একটি পরমাণু চুল্লির কার্যকর জীবন শেষ হয়ে গেলে শুরু হয় তার পরবর্তী জীবন। চুল্লির ভিতরে তেজষ্ক্রিয় কোবাল্ট ৬০ এবং লোহা ৫৫ ও কার্বন এবং ক্যালসিয়ামের তেজষ্ক্রিয় সমস্থানিক (isotope) থাকার কারণে ১০ থেকে ১০০ বছর লেগে যায় চুল্লিটিকে ভাঙার কাজ শুরু করতে। ততদিন এবং তারপরও সেটাকে নিরাপত্তার সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। তারপর আছে সমাহিত করা। এই গোটা প্রক্রিয়াটায় কত শক্তি খরচ হতে পারে তার কোন তথ্য নেই। আন্দাজ করা যায়, ৮০,০০০-১,৬০,০০০ লক্ষ কোটি জুলের মতো শক্তি প্রয়োজন এতে।

এছাড়াও রয়েছে, শীতলায়নের জল পরিশোধন, তেজষ্ক্রিয় বর্জ্য সমাহিত করা (যার শক্তি খরচ প্রায় একটি নতুন পরমাণু চুল্লি তৈরির মতো) প্রভৃতি কাজ যেগুলি সবকটিই করতে হয় প্রচুর জীবাশ্ম জ্বালানি খরচ করে, অর্থাৎ কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপাদনের বিনিময়ে।

হিসেব করে দেখা যায়, একই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম একটি গ্যাসীয় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে যা শক্তি খরচ হয়, একটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে তেজষ্ক্রিয় বর্জ্য সমাহিতকরণের খরচ বাদ দিলেও তার দশগুণ শক্তি লাগে।

কেবল নিম্নে বর্ণিত শর্তগুলি পূরণ করলে পরমাণু বিদ্যুৎ গ্রীনহাউস গ্যাসের উদ্‌গীরণ কমানোতে একটা ভূমিকা নিতে পারে :

১) সমস্ত বর্তমানের পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র পালটে ফেলে নতুন ৪৪১টি কেন্দ্র গড়তে হবে।

২) বিদ্যুৎ উৎপাদনের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পরিমাণের অর্ধেক পরমাণু বিদ্যুতকে মেটাতে হবে।

৩) কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অর্দ্ধেককে পরমাণু কেন্দ্র দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে হবে।

এটা করতে গেলে প্রতি সপ্তাহে একটা করে পরমাণু চুল্লি তৈরি করতে হবে আগামী ৫০ বছর ধরে! এখন একটা চুল্লি বানাতে লাগে ৮ থেকে ১০ বছর, এবং ইউরেনিয়াম মজুত পৃথিবীতে খুব অল্প। সে বিচারে ৫০ বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে একটি চুল্লি — অসম্ভব ব্যাপার! কেউ কেউ বলেন ইউরেনিয়াম নেই তো কী হয়েছে? প্লুটোনিয়াম পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে কাজ চালানো হবে! পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ বিপজ্জনক, বোমা তৈরির প্রযুক্তি!

দীর্ঘ আলোচনার শেষে লিউএন ও স্মিথ সিদ্ধান্তে আসেন, "সবকিছু অনুকূল হলে পরমাণু বিদ্যুৎ গ্যাসীয় তাপবিদ্যুতের চেয়ে দুই তৃতীয়াংশ কম কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ ঘটায়। এই অবনমনের জন্য যে গুণমানের ইউরেনিয়াম লাগবে তা ন'বছরে শেষ হয়ে যাবে যদি গোটা পৃথিবীকে পরমাণু বিদ্যুতে চালাতে হয়। আর এর থেকে কম গুণমানের ইউরেনিয়াম ব্যবহারে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণ তাপবিদ্যুতের তুলনায় বেশি হবে।"

মন্থন সাময়িকী'র গ্রাহক হোন

এক বছরে ছ'টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা, সরাসরি নিলে ৪০ টাকা, ডাকযোগে ৫০ টাকা।

যোগাযোগ: জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, ডাক: বড়তলা, কলকাতা ১৮, দূরভাষ: ২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল: jiten_nandi@vsnl.net

http://manthansamayiki.googles.com

অশনি সংকেত
রাঁচীতে ছোটো কারবারিদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ

কল্যাণী কে মীনা

বরাবরের মতো এবারও ঝাড়খণ্ডের সাধারণ মানুষ বুঝিয়ে দিল তারা সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকে সফল হতে দেবে না। ঝাড়খণ্ডের শ্রমজীবী মানুষ, ছোটো ছোটো কারবারি পুরুষ-মহিলা সকলেই বুঝেছে, তাদের একসময়ের 'আপন'রা রাজা-উজির হওয়ার পর পুঁজির হাতে বিক্রি হয়ে গেছে, পঙ্গু হয়ে গেছে তারা। মানুষ বুঝেছে, গত সাত বছর ধরে কেমন করে বিশ্বায়নের রাহু নতুন ঝাড়খণ্ডের সুখস্বপ্নগুলোকে ধীরে ধীরে গিলে ফেলছে। বলছে, বড়ো মেশিন বড়ো কারবার বড়ো পুঁজি, ছোটো কিছুরই অস্তিত্ব অর্থহীন বেকার। তাই প্রথমে শুরু হল রাস্তা চওড়া করা, সৌন্দর্যসাধনের নামে বস্তি উচ্ছেদ, হকার আর ছোটো ছোটো দোকানদারদের উচ্ছেদ। তারপর আসছে বড়ো বড়ো 'মল', বিগবাজার ইত্যাদি। এবার এসেছে 'রিলায়েন্স ফ্রেশ', অর্থাৎ টাটকা (!) সবজি ফল সমেত কৃষিজ সামগ্রী এয়ার কন্ডিশন্ড দোকানে ফ্রিজে রাখা বাক্স থেকেই পাওয়া যাবে ২৪ ঘন্টা। নোংরা ছেঁড়া জামাকাপড় পরা গেঁয়োগুলোর কাছ থেকে এখন আর জল-কাদা-ধুলো ভরা রাস্তায় নেমে ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে সবজি কিনতে হবে না, ফল কিনতে হবে না। সুনিশ্চিত রোজগারের পয়সা অসংগঠিত বাজারে কোনভাবেই যাবে না সোজাসুজি। তার ওপর বিজ্ঞাপনের রঙিন আলো সমাজের নীচের তলার কিছু যুবক-যুবতীদেরও দলে টানবে। অন্যদিকে ছোটো ছোটো চাষীরা চাষের অনিশ্চয়তায় আর বেড়ে চলা উৎপাদন খরচের ভারে হাঁফিয়ে উঠেছে। এই অসহায়তাকে পুঁজি করে রিলায়েন্স এখন চাষের জন্য চাষীদের জমি চাইছে। অর্থাৎ জমির মালিক এখন হবে মজুর আর রিলায়েন্স হবে মালিক। চাষীরা ভাবছে, জমি থেকে তাদের একটা সুনিশ্চিত আমদানি হবে, অনিশ্চয়তা আর বাজারের ফাটকাবাজি থেকেও তারা রেহাই পাবে। তাই লড়াই শুরু হয়ে গেছে কৃষক আর কৃষিজ ব্যাপারীর মধ্যেও। প্রথম দল রিলায়েন্সের ওকালতি এই জন্য করছে যে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বেশি দাম পাবে। ছোটো কারবারিরা এই জন্য হয়রান যে তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে।

হয়েছেও তাই। ইতিমধ্যেই সবজি ও ফল-বাজারের চমক অর্ধেক ফিকে হয়ে গেছে। ভিড় এখন সন্ধ্যেবেলায় 'রিলায়েন্স ফ্রেশ'-এর সামনেই। সেই ভিড় সামাল দিতে মেইন রোডগুলোতে ট্রাফিক পুলিশ দিতে হচ্ছে।

ঝাড়খণ্ডের রাঁচী শহরেই এখন চারটে দোকান খুলে গেছে, আরও কয়েকখানা খোলার প্রস্তাব রয়েছে। ফিরায়ালালের মতো প্রতিষ্ঠিত পুরনো ঐতিহ্যবাহী বড়ো দোকানও বিক্রি করে দেওয়ার জন্য রিলায়েন্সের সঙ্গে চুক্তি করতে চাইছে। ঝাড়খণ্ড রাজ্য হওয়ার পর থেকেই সাধারণ দোকানদার, মজুর/শ্রমিক, ডোম-ভাঙি-সাফাইকর্মীরা লাগাতার সরকারি দমন-পীড়ন সহ্য করে আসছে। এবার তাদের সহ্যের বাঁধ ভাঙল। ৮ মে সর্বপ্রথম স্থানীয় সবজি বিক্রেতারা রাস্তায় নেমে বড়ো ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এত বড়ো স্বতস্ফূর্ত অরাজনৈতিক আন্দোলন[†] বহুকাল রাঁচী শহরে দেখা যায়নি।

ডেইলি মার্কেট, বরিয়াতু, কাঁকে রোড, লালপুর, বহুবাজার থেকে হাজারে হাজারে সবজি দোকানদার 'রিলায়েন্স ফ্রেশ'-কে অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি নিয়ে রাস্তায় নামে। প্লাজা-স্থিত 'রিলায়েন্স ফ্রেশ'-এর দোকানের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এরপরে অ্যালবার্ট এক্কা চক-এর সামনে মেইন রোড অবরোধ করলে তখনই প্রশাসনের টনক নড়ে। পুলিশ এসে বোঝানোর পরে বিক্ষোভকারীরা ডিসি অফিস ঘেরাও করে। ডিসি-র সঙ্গে দেখা করে বিক্ষোভকারীদের এক প্রতিনিধিদল দাবি করে, 'রিলায়েন্স ফ্রেশ'-এর সমস্ত দোকান অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ছোটো ছোটো ব্যাপারীদের ভাতে মারার ষড়যন্ত্র সরকারকে বন্ধ করতে হবে। ডিসি রাজ্য সরকারের কাছে এই দাবি পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে তবেই ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। এই প্রতিবাদ আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ।

এরপর অন্য অনেক ট্রেড ইউনিয়ন এবং রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনকে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দেয়। ঘোষণা করা হয়, ১১ মে রাঁচীর সমস্ত ফল ও সবজির দোকান বন্ধ থাকবে। ১২ মে 'বিহার প্রগতিশীল মজদুর ইউনিয়ন'-এর ঝান্ডার নীচে কয়েক হাজার সবজি ও ফল বিক্রেতা পুনরায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য একত্রিত হয়। আলাদা আলাদা গ্রুপে ভাগ হয়ে তারা সমস্ত 'রিলায়েন্স ফ্রেশ' দোকানের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং শ্লোগান দিতে থাকে। পুলিশ তখন ক্রিকেট খেলা দেখতে ব্যস্ত, যদিও আগে থেকেই পুলিশের কাছে এই কর্মসূচীর খবর ছিল। রোদের তাপে আর খিদে-তেষ্টায় লোকে একসময় অধৈর্য হয়ে পড়ে। সার্কুলার রোডের 'রিলায়েন্স ফ্রেশ'-এ প্রথম পাথর ছোঁড়া শুরু হয়। ভিড়ের মধ্যে অসামাজিক কিছু লোক ঢুকে পড়ে তোড়ফোড় শুরু করে দেয়। সেই খবর হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে পড়ে। অন্য 'রিলায়েন্স ফ্রেশ'-এও তোড়ফোড় শুরু হয়ে যায়। ভুক্তভোগী ফল ও সবজিওয়ালাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন রাজনৈতিক নেতাদের সান্নিধ্যে হিংসাত্মক রূপ নেয়। পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করলে তাদের ওপরও হামলা হয়। ক্রোধে উন্মত্ত পুলিশ মহিলা-বাচ্চাদেরও বাদ দেয় না। ক্রেতারাও রেহাই পায় না। মোটর সাইকেল, স্কুটার ইত্যাদি ভাঙচুর হয়। সব মিলিয়ে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা অনুমান করা হচ্ছে। ঝাড়খণ্ড বিকাশ পার্টির নেতা উদয় শঙ্কর ওঝা সহ প্রায় ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের মধ্যে চারজন মহিলাও ছিলেন। বাচ্চাদেরও থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। ঝাড়খণ্ড বিকাশ পার্টির নেতা পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বাবুলাল মারাণ্ডি ঘোষণা করেন, পার্টি শ্রী ওঝার আন্দোলনকে সমর্থন করে না। এরপর কয়েকজন জামিনে ছাড়া পেলেও ওঝা সহ বেশ কয়েকজন এখনও জেলের মধ্যে আছেন। গরিব দোকানদার মহিলা-পুরুষ যারা পুলিশের ভয়ানক মারে মাথা ফাটিয়েছে, যাদের হাত-পা-পাঁজর ভেঙেছে, তাদের কথা এখন আর কেউ জানে না। সংবাদমাধ্যমেরও তাদের প্রতি আর কোন আগ্রহ নেই।

এই আন্দোলনে স্বভাবতই দুই বিপরীত প্রতিক্রিয়া চারিদিক থেকে আসছে। একদিকে, যারা বেতনভোগী মধ্যবিত্ত, তাদের বক্তব্য হল, আমরা রাত ন'টার সময় কাজ থেকে ফিরে আরামে বাজার করতে পারি। দাম দরাদরি ওজনে ঠকবার ভয় নেই, ভিড় কাদা বা পার্কিং-এর টেনসন নেই। বড়ো ও মাঝারি কৃষক বলছে, দালালের ওপর নির্ভর করতে হয় না, ফসলের দাম বেশি পাচ্ছি, এতে তো লাভই হচ্ছে।

[†] *রাজনৈতিক পার্টির বাইরে আন্দোলন।*

ছোটো কৃষকদের মনে লোভ, একটা নিশ্চিত ভাড়া নিয়ে জমিটাকে একটা তৃতীয় পক্ষের কাছে লিজ দেওয়া যাবে। চাষ নিয়ে আর পাড়াপড়শির সঙ্গেও ঝগড়া-ঝঞ্ঝাট লেগে থাকবে না। দিব্যি নিশ্চিন্তে বাইরে গিয়ে কাজও করতে পারব। জমি তো আর পালিয়ে যাবে না।

অপরদিকে, গরিব লোকেদের একমাত্র আক্ষেপ ও অভিযোগ হল : বাবু, সবজিও বেচতে পারব না, তো কী করব? কী করে পেট ভরাব? আমাদের তো চাকরি-বাকরিও নেই, কী করে খাব? এই ছোটো ছোটো ব্যবসাই তো আমাদের একমাত্র রোজগারের উপায়। ঘর-পরিবার, বাল-বাচ্চা তো এই রোজগারেই নির্ভর করে আছে। বড়ো বড়ো লোকেদের তো অনেক বড়ো বড়ো কারখানা, কতরকমের ব্যবসা আছে। তবে আমাদের ছোটো কারবার বন্ধ করে দিতে চাইছে কেন? তাহলে আমরা কী করে বাঁচব?

আসল প্রশ্নটা এখানেই। এই ছোটো ছোটো লোকেদের বাঁচার জন্য কি সত্যি কেউ মাথা ঘামায়? সরকার, বুদ্ধিজীবী কেউ? বড়ো বড়ো পুঁজিপতিরাই এখন সবকিছু — সরকার, নীতি, কানুন, সবকিছু — নিয়ন্ত্রণ করছে। সেই কারণেই তো কথায় কথায় হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট আদেশ করে হকার উচ্ছেদ কর, বস্তি উচ্ছেদ কর। এরা সব জঞ্জাল, শিরঃপীড়া, অবাঞ্ছিত, দৃষ্টিকটু। সেই কারণে স্বাস্থ্যনীতি, শিক্ষানীতি বিড়লা-আম্বানি গোষ্ঠীরাই তৈরি করে। পার্ক, ময়দান, খেলাঘরের রক্ষণাবেক্ষণও এদেরই বদান্যতা-নির্ভর।

ঝাড়খণ্ড কৃষি বিপণন পর্ষদের বক্তব্য অনুসারে আগামী পাঁচ বছরে সমস্ত খুচরো কারবারও বড়ো বড়ো কোম্পানির হাতে যাবে। তারা ২০ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার এতে বিনিয়োগ করবে। এর বড়ো অংশ ঝাড়খণ্ডে আসবে। এর ফলে আগামীদিনে কমপক্ষে ৪ কোটি ছোটো দোকানদারের রোজগার বন্ধ হবে।

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং অদূরদর্শী নেতৃত্বের ফলে ১২ মে-র আন্দোলন হিংসাত্মক চেহারা নেওয়াতে ছোটো ছোটো দোকানদারদের স্বতস্ফূর্ত আন্দোলন নিঃসন্দেহে এক বড়ো রকম ধাক্কা খেয়েছে। সাধারণ লোক এই অরাজকতা বা হিংসা চায়নি। তারা চেয়েছে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন এবং নীতিগত সমাধান। লোকে তাই এখনও মিটিং চালিয়ে যাচ্ছে, অরাজনৈতিক মজবুত নেতৃত্বের সন্ধান করছে। ঝাড়খণ্ডে তা তখনই সম্ভব, যখন অন্যান্য জনআন্দোলনগুলি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। একমাত্র তখনই খুচরো কারবারিদের 'রিলায়েন্স ফ্রেশ'-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের অংশ হয়ে উঠবে। যেমন, জল-জঙ্গল-জমি বাঁচাও আন্দোলন, উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন, পরিবেশ-রক্ষা আন্দোলনও এক বৃহত্তর আন্দোলনের অংশ।

'ছোটো'দের এই প্রয়াস 'বড়ো'দের বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। তথাকথিত প্রগতিশীল শ্রমিকদরদী পার্টিদের অপ্রস্তুত করেছে। তাই তারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে বাধ্য হচ্ছে। না করে আর উপায় কী?

তারা কে কী বলছে? জেডিইউ নেতা জর্জ ফার্নান্ডেজ রাঁচীতে এসে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। হয়ত নতুন করে আবার পায়ের তলায় শক্ত মাটি ধরার চেষ্টা করছেন। বলেছেন, 'লম্বি লড়াই হো জায়েগি, পুঁজিবাদ নহী চলেগা'। আরজেডি-র প্রদেশ মহাসচিব বলেছেন, 'রিলায়েন্স ফ্রেশ' গরিব বিরোধী, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এর বিরোধ হওয়া দরকার।ছাত্রযুব সংঘর্ষ সমিতির সহ সংযোজক বলেছেন, 'রিলায়েন্স ফ্রেশ' এখন সস্তাদরে জিনিস দেওয়ার প্রলোভন দেখাচ্ছে লোককে। আগামীদিনে যখন গুছিয়ে জাঁকিয়ে বসবে তখন দাম বাড়াবে। ক্রেতাদের অবস্থা আরও খারাপ হবে। বেকারি বাড়বে। এই কারণে গোড়াতেই বিরোধিতা জরুরি।

ঝাড়খণ্ড ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতারা একসুরে বলছেন, খুচরো ব্যবসায় বড়ো কোম্পানিদের আসা উচিত নয়, গরিবদের রুজি-রুটির ওপর মার পড়লে অসন্তোষ আরও বাড়বে। সিপিআই নেতা শ্রী খগেন্দ্র ঠাকুর বলেন, বড়ো কোম্পানিদের কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা অনুচিত। সিপিআইএমএল রাজ্যসচিব শুভেন্দু সেন বলেন, 'রিলায়েন্স ফ্রেশ' নতুন কিছু নয়, বিশ্বায়নের আর এক রূপ। একসময় যেমন ইংরেজরা তাঁতীদের আঙুল কেটে নিয়ে পঙ্গু করে দিয়েছিল, আজ বড়ো কোম্পানিরা খুচরো কারবারিদের পঙ্গু করে নিজেরা ফুলে ফেঁপে উঠছে। এর বিরুদ্ধে লম্বা লড়াই আবশ্যক। ন্যাশনাল হকার্স ফেডারেশন, খুচরো এবং থোক সবজি ও ফল বিক্রেতা সঙ্ঘও বলে, 'রিলায়েন্স ফ্রেশ' গরিবদের ওপর পুঁজিবাদী হামলার আর এক উদাহরণ। এর বিরোধিতা আবশ্যক।

রাঁচীতে ছোটো দোকানদারদের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ও সংঘর্ষ পুঁজিবাদ ও তার ধারকবাহক মধ্যশ্রেণীর এক অন্তিম শিখরে পৌঁছানোরই অশনি সংকেত।

নন্দীগ্রাম-খেজুরিতে সেনা তলবের আহ্বান ... ১৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

দেশের অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় কৃষকদের জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনকে দমন করার জন্য আধা সামরিক বাহিনী অবধি মোতায়েন করা হয়েছে। সেই সামরিক বাহিনীকে তলবের দরকার পড়ল 'সেজ'-এর জন্য জমি অধিগ্রহণ বিরোধী সফল গণ প্রতিরোধের অকুস্থল নন্দীগ্রাম ও তার সংশ্লিষ্ট অঞ্চল খেজুরিতে শান্তি ফেরানোর জন্য? এ দেশের কোথায় সামরিক বাহিনী শান্তি ফিরিয়েছে? কোথায় উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করে শান্তি ফেরানো গেছে? ক্ষণকালের শ্মশানের শান্তি কোথাও কোথাও এলেও পরমুহূর্তে অশান্তির বান ডেকেছে সর্বত্র। আর সে অশান্তির মূল হোতা সামরিক বাহিনী এবং উপদ্রুত অঞ্চল আইনের মাধ্যমে তার যথেচ্ছাচারের লাইসেন্স। মণিপুর, কাশ্মীর, অসম ... এসব একদম টাটকা উদাহরণ। কেউ যুক্তি দিয়েছে, দাঙ্গার সময় তো আর্মি নামানো হয়। দাঙ্গা রুখতে আর্মি নামানো কতটা যুক্তিযুক্ত, কতটা ফলপ্রসূ, তার থেকেও কোন ভালো পন্থা আছে কিনা, এসব প্রশ্নের অবকাশ থাকলেও প্রাথমিক আর একটি প্রশ্ন তো থেকেই যায়, নন্দীগ্রামে কি দাঙ্গা হচ্ছে? বেআইনি অস্ত্র মজুতের কথা প্রসঙ্গে বলা যায়, সেসব এল কোথা থেকে? কিভাবে? সাপ্লায়ার কারা?

নন্দীগ্রামের গণপ্রতিরোধে 'সেজ' হয়ত থেমেছে সেখানে, কিন্তু খেজুরির কাছেই রয়েছে আর একটি চলমান গণ-প্রতিরোধের স্থান। হরিপুর। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে সেখানেও নিজেদের এলাকা প্রায় নিজেদের দখলে নিয়ে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে সেখানকার কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবীরা। সেখানকার মানুষরাই বলেছিল, এই লড়াইয়ের মোকাবিলায় আসতে পারে কেন্দ্রীয় সামরিক বাহিনী, যেহেতু স্থান পরিদর্শনে এসেছিল কেন্দ্রীয় সরকারি লোকেরা। তবে কি উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণার তোড়জোড় হরিপুরের দিকে তাকিয়ে? কে জানে!

উচ্ছেদবিরোধী বাম মঞ্চের একটি সভায় শুনছিলাম, দক্ষিণপন্থা কেবল পার্টি দিয়ে হস্তক্ষেপ করে না, তার কায়দা বিবিধ। 'নিরপেক্ষ' আগ্নেয়াস্ত্রধারী 'তৃতীয় পক্ষ'-র আবাহন-রহস্যের তাই কিনারা হওয়া জরুরি।

৩ জুন ২০০৭ শমীক সরকার, যাদবপুর

গুজ্জরদের প্রতিবাদ এবং সংরক্ষণের রাজনীতি

শৈল মায়ারাম

***The Hindu** পত্রিকার ২ জুন ২০০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত শৈল মায়ারাম-এর **Caste, tribe, and the politics of reservation** প্রবন্ধটি এখানে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা হল। অনুবাদক জিতেন নন্দী। পত্রিকার পক্ষ থেকে পাদটীকা সংযোজিত হল।*

তপসিলি উপজাতির মর্যাদা আদায়ের জন্য রাজস্থানের গুজ্জর সমাজের আন্দোলন এখন যে স্তরে পৌঁছেছে, ভারতীয় জনতা পার্টি এবং কংগ্রেস উভয় দলের সঙ্গে যুক্ত ওই সমাজ-গোষ্ঠীর নেতারা তাকে সমর্থন করেছে। গুজ্জর সমাজের কিছু অংশ হিংসার যে পথ নিয়েছে, তার রাশ টেনে ধরতে এখন এদের দরকার আর একটা চৌরিচৌরা[‡]।

ঘটনা হল, প্রতিনিধিত্ব ও সংরক্ষণের দাবি নিয়ে উচ্চারিত এক ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক প্রতিবাদকে রাজস্থানের সরকার এক ক্রুদ্ধ জনতার হাঙ্গামায় পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের ফলে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়েছে। অগ্রিম গোয়েন্দা রিপোর্ট কি পাওয়া যায়নি? নাকি সেসবের পরোয়া করা হয়নি? গুজ্জরদের তপসিলি উপজাতিভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন গত বছর জুড়েই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কেন্দ্রে বাজপেয়ী পরিচালিত সরকারের আমলে জাঠদের ওবিসি (অন্যান্য পিছিয়ে পড়া) শ্রেণীভুক্ত ঘোষণা করার সময় থেকেই অবশ্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। রাজস্থান বিজেপির নির্বাচনী ইশ্‌তেহারেই এই প্রতিশ্রুতি ছিল যে গুজ্জরদের বর্তমান ওবিসি অবস্থান থেকে "উন্নত" করা হবে।

গুজ্জরদের এই প্রতিবাদের নানান শিক্ষা রয়েছে। পশ্চাদপদতার প্রশ্নটা হল প্রথম। সারা দেশে গুজ্জরদের সংখ্যা আনুমানিক ১.৬ কোটি। নিজেদের মধ্যে এরা ধর্ম, পেশা ও সামাজিক-অর্থনৈতিক মর্যাদার দিক থেকে বিভক্ত। ঐতিহাসিকভাবে এক বিপুল সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী-উপাদান নিয়ে গঠিত গুজ্জর সমাজ। একদিকে উত্তর ভারতের গুর্জর-প্রতিহার শাসকবর্গ, অন্যদিকে জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকার গুজ্জর ও বকরওয়াল যাযাবর গোষ্ঠী, যারা এখন মূলত সুন্নি মুসলমান। শোনা যায়, ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে গুজরাত, কাথিয়াওয়াড় এবং রাজস্থান থেকে এরা কাশ্মীরে গিয়েছিল। আরও আগে জর্জিয়া থেকে মধ্য এশিয়া, ইরাক, ইরান ও আফগানিস্তান হয়ে এদের অভিপ্রয়াণ ঘটে। উত্তরাখণ্ডে এরা হল এক অরণ্যবাসী সমাজ, যাদের বন গুজ্জর বলা হয়। রাজস্থানের গুজ্জর গ্রামগুলি রয়েছে আরাবল্লি অরণ্যে। এদের "পুনর্বাসন" (পড়ুন উচ্ছেদ) করতে চাওয়া হয়েছিল সরিস্কা ও রান্থাম্ভরের ন্যাশনাল পার্ক থেকে।

গুজ্জরদের প্রতিবাদ সামাজিক বিভাগ নিয়ে আরও বড়ো এক প্রশ্ন তুলেছে। ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বের সরকারি মানসিকতায় দেখা গেছে এক ধরনের বিভাগ। এধরনের গোষ্ঠীগুলি কি উপজাতি না জাত বিভাগের অন্তর্গত? কাশ্মীর ও রাজস্থান উভয় রাজ্যেই গুজ্জররা পশুপালক, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা থিতু হয়ে পড়েছে। তাদের কি ওবিসি বা তপসিলি উপজাতি বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত? অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুর্ব রাজস্থানের রাজস্ব প্রশাসনে গুজ্জরদের শূদ্র অবস্থানভুক্ত চাষী গোষ্ঠী হিসেবে ধরা হয়েছিল। একই রকম অবস্থান ছিল মীনা, মেও, জাঠ এবং আহিরদের। তৎসত্ত্বেও, প্রাচীন লোককথায় আরও বিপরীতধর্মী পশুপালক অবস্থানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এক মেওয়াতি লোক-মহাকাব্যে রয়েছে, এক গরিব গুজ্জর মেয়ের একমাত্র গরু বাঘে মেরে দিয়েছে। সে পাহাড়ে বসে কাঁদছে। শেষে মেও ডাকাতেরা এসে তাকে সাহায্য করছে।

আর একটি বিষয় হল রাজ্যগত বিভাগগুলিতে অন্তর্ভুক্তির রাজনীতি। রাজস্থান রাজ্য গঠনের পরে মীনাদের তপসিলি উপজাতিভুক্ত ঘোষণা করা হল, গুজ্জরদের করা হল না। মীনারা ছিল অম্বর রাজত্বের আমলে পূর্বতন শাসক গোষ্ঠী, যাদের রাজপুতেরা ক্ষমতাচ্যুত করে, অনেকটা রাজস্থান ও গুজরাতের অন্যত্র ভিল রাজাদের মতো। মীনাদের নিজেদের মধ্যে বিভাগ ছিল — জমিদার ও চৌকিদার মীনা — যা থেকে কৃষক সমাজের মধ্যবর্তী স্তরে তাদের উপস্থিতি বোঝা যায়। অম্বর/জয়পুর রাজত্বে মীনাদের এক বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল — তাদের সিঁদুর দিয়ে রাজাকে তৈলাদি লেপন করা হত এবং তারা রাজকোষ পাহারা দিত। মুঘল আমলে গুজ্জরদের এক শূদ্র গোষ্ঠী হিসেবে ধরা হত। বহু-প্রসারিত জয়পুর রাজত্বে তাদের জন্য আলাদা রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল। পূর্ব রাজস্থানে ব্রাহ্মণদের দিতে হত উৎপন্ন ফসলের ১২%, রাজপুতদের ৩৩% এবং রায়ত গোষ্ঠীভুক্ত মীনা, গুজ্জর, জাঠ ও অন্যদের ৭৬% পর্যন্ত।

ঔপনিবেশিক আমলে উত্তর ভারতের চাষী সমাজের এক সামান্য অংশের মধ্যে — জাঠ সমেত — ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এরা পূর্ব যমুনা ক্যানালগুলি থেকে লাভবান হয়েছিল। কিন্তু বেশিরভাগ চাষী-জাত এবং পশ্চিমাঞ্চলের জাঠ গোষ্ঠীগুলি উচ্চ রাজস্ব নির্ধারণের চাপে, বারবার দুর্ভিক্ষ এবং ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝায় ভয়াবহ হতাশজনক পরিস্থিতির শিকার হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গুজ্জর, মীনা, মেওয়াতি হানাদার বাহিনীর উদ্ভব হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর থেকেই অপরাধবৃত্তির ঔপনিবেশিক ধারণার জন্ম হয় এবং ১৮৭০-৭১ সালের কুখ্যাত 'ক্রিমিনাল ট্রাইব্‌স অ্যাক্ট' এই ধারণারই ফসল। গুজ্জর ও মেওয়াতিদের মতো চাষী-পশুপালক গোষ্ঠীগুলির বিক্ষোভের ফলে গড়ে ওঠে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ। তবুও উইলিয়াম ডালরিম্প্‌ল-এর মতে তা প্রথম ধর্মযুদ্ধ[§]!

গুজ্জর সমাজের এই বহুপার্শ্বীয় চলন অতঃপর ন্যায্য গণতান্ত্রিক

[‡] *উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর শহর থেকে ১৫কিমি দূরত্বে চৌরিচৌরা গ্রামে ১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারির ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানীয় বাজারে বিদেশি কাপড়, পানীয় ইত্যাদি না-কেনার জন্য এক শান্তিপূর্ণ গণ পিকেটিং পুলিশের গুলিচালনায় অশান্ত হয়ে ওঠে। ক্রুদ্ধ জনতা থানায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে ২২জন পুলিশকে পুড়িয়ে মারে। এই ঘটনায় বরদোলিতে উপস্থিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজির নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী গণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়। [সূত্র :The Struggle for Freedom, সম্পাদনা: রমেশ চন্দ্র মজুমদার]*

[§] *ঐতিহাসিক উইলিয়াম ডালরিম্প্‌ল-এর লেখা ২০০৭ সালে প্রকাশিত বই **The Last Mughal: Fall of a Dynasty: Delhi, 1857**-এর উল্লেখ করা হয়েছে।*

আকাঙ্ক্ষা এবং নাগরিকত্বের দাবিদার। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'হার্লেম রেনেসাঁ'-র আফ্রো-আমেরিকান নেতারা যখন দেখলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে তাঁরা বেশিমাত্রায় যথাযথ বিচার ছাড়াই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন, তাঁরা মুষড়ে পড়েছিলেন**। একইভাবে গুজ্জরদের দাবি যে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রামে এবং ভারতীয় রাষ্ট্রে তাদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে††। মীরাট, বিজনোর, আলওয়ার এবং ভরতপুর জেলায় তারা ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে যেভাবে জড়ো হয়েছিল ১৮৫৭-তে, তাদের দাবি, সেই ভূমিকা আজও স্বীকৃতি পায়নি।

এখনকার প্রতিবাদ হল চাকরি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজেদের হকদারি নিয়ে। গুজ্জরদের অনুভব হল, গত ৫০ বছরে মীনারা তপসিলি উপজাতিভুক্ত ঘোষিত হওয়ার ফলে তুলনামূলক সামাজিক-অর্থনৈতিক মর্যাদার বিচারে গুজ্জরদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। যেখানে রাজ্যে এবং সর্বভারতীয় কর্মক্ষেত্রে মীনারা উচ্চ প্রতিনিধিত্ব অর্জন করে নিয়েছে, সেখানে গুজ্জররা খনি ও নির্মাণ শিল্পে এবং বড়ো জোর ছোটোখাটো করণিকের কাজে নিযুক্ত রয়েছে। এই ক্ষোভের ভিতরে রয়েছে অর্থনৈতিক বিকাশের সেই মডেলটির সমালোচনা যা নীচুতলায় চুঁইয়ে পড়েনি। এই ক্ষোভ বুঝিয়ে দিচ্ছে নয়া উদারনৈতিক উন্নয়নের মডেলটির ব্যর্থতা, যা ঝকমকে SEZ (বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল), ফিল্মসিটি আর পান্না সোনা হীরের বাজার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অথচ প্রত্যন্ত গ্রামের আবশ্যকীয় মাটির নীচের জলস্তর কমে আসা, ফসলের উৎপন্নে ঘাটতি এবং জীবিকার সঙ্কটকে ওই উন্নয়ন অবহেলা করে।

গুজ্জরদের প্রতিবাদ জাতপাতের রাজনীতিতে পরিবর্তনের আর এক মুহূর্তকে সামনে নিয়ে আসছে। লুই দুমোঁ‡‡ পশ্চিমী মানুষের (homo aequalis) বিপরীতে ভারতীয়কে যেভাবে ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগ সম্পন্ন (homo hierarchus) মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন, স্পষ্টতই আজ তার বিচার-বিবেচনা প্রয়োজন। এটা ঠিক যে জাতব্যবস্থার মধ্যে অসম রীতি ও সামাজিক মর্যাদা এবং অস্পৃশ্যতাও রয়েছে। কিন্তু আজকের জাত ন্যায় ও সমান অধিকার দাবি করছে। অতএব, অতীতে নীচু জাতের লড়াইয়ে উঁচু জাতকে হটিয়ে দেওয়ার যে মনোভাব ছিল, আজকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জাতের বিষয় হল সমাজের সুবিধাভোগী স্তরকে মোকাবিলা করা। জাঠরা ওবিসিদের প্রাপ্য সমস্ত সুবিধা নিয়ে নিচ্ছে এবং অন্যরা মার খাচ্ছে, গুজ্জরদের এই আশঙ্কা আহির, মালি এবং অন্যান্যরাও সমর্থন করে।

তৎসত্ত্বেও গুজ্জরদের এক আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন যে, কেন একটা অহিংস 'চাক্কা জাম' কর্মসূচি হিংসার পথে চলে গেল। সংরক্ষণের রাজনীতির বৃহত্তর সমস্যা নিয়েও তাদের আত্মসমীক্ষা করতে হবে। যদি সুবিধাভোগী স্তরটি রাজস্থানের ফুলে-ফেঁপে ওঠা ওবিসি বিভাগ দখল করে বসে, তা তপসিলি উপজাতি বিভাগটির পক্ষে আরও অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। সেখানে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে প্রকৃত পিছিয়ে পড়া ভিল ও গারাসিয়া উপজাতির প্রান্তিক অবস্থান আরও চরমে পৌঁছেছে। সামাজিক ন্যায়কে ভালোভাবে নিশ্চিত করার মতো বিকল্পের জন্য সর্বভারতীয় বিতর্কে যোগেন্দ্র যাদব এবং সতীশ দেশপাণ্ডে যে মডেল হাজির করেছেন, তাতে সুবিধাপ্রাপ্তদের সন্তানেরা জাত-উপজাতি কোটা থেকে সুবিধা টেনে নিতে পারবে না। এছাড়া, কেবল তপসিলি উপজাতি তালিকাভুক্ত হলেই কি উপযুক্ত মানের ইস্কুল-শিক্ষা, উন্নতমানের তালিম এবং কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত হবে? শেষত, সংরক্ষণের ফলে যে লিঙ্গবৈষম্য প্রায়শ স্বাভাবিক ফল হিসেবে আসে, বিশেষত কিছু উন্নতি করা ব্যক্তির ক্ষেত্রে তো লক্ষ্য করা গেছে — যারা নিজেদের জাত-বৌকে গ্রামে রেখে দেয় আর শহরে ভিন্ন-জাতে আর একটা বিয়ে করে — সেটাই বা কীরকম?

** *নিউ ইয়র্ক শহরের কাছাকাছি অবস্থিত হার্লেম অঞ্চলটি কালো মানুষের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। ১৯২০-র দশকে হার্লেমে কালো সংস্কৃতি ও শিল্পসৃষ্টির নবজাগরণ হয়। [সূত্র : উইকিপিডিয়া]*

†† *এর একরকম স্বীকৃতি* **Imperial Gazetteer of India**-*তে রয়েছে। তবে ব্রিটিশ আইনে এদের অপরাধী উপজাতিদের তালিকাভুক্ত করার ক্ষেত্রে ন্যায্য জীবিকার উপায়হীন যাযাবরবৃত্তির পাশাপাশি ব্রিটিশ বিরোধী ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে এদের সক্রিয় অংশগ্রহণও কারণ হিসেবে এসেছিল।*

‡‡ *জাত ব্যবস্থা সম্পর্কে ফরাসি নৃতত্ত্ববিদ লুই দুমোঁর রচনা* **Homo Hierarchicus: Essai sur le système des castes (1966)** *।*

গণহত্যার অর্থ

কৃশানু মিত্র

বাধ্যতা কখনও মান্যতা প্রদান করে আবার কখনও হারায়। যখন মান্যতা পায় তখন দীর্ঘ হয় শাসনকাল, হারালে গণহত্যা। এ ধোঁয়াশার আবরণ উন্মোচিত হোক। NSSO-র সার্ভে অনুযায়ী বামফ্রন্ট শাসনকালের প্রথমদিকে দারিদ্র্যসীমার নীচে লোকসংখ্যা যা ছিল রাজত্বের মাঝবয়সে তা কুড়ি শতাংশ কমে আসে। যুক্তফ্রন্ট আমলে হরেকৃষ্ণ কোঙার মহাশয় জমি সংক্রান্ত এক উৎকৃষ্ট রেসিপি তৈরি করেন। বৌ, ছেলে, মেয়ে, দেবোত্তরের নামে রাখা প্রচুর জমি ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ক্ষেতমজুর, ভাগচাষী, গাড়োয়ান, ছোটো ব্যবসায়ী, আড়তিয়া, কৃষির সঙ্গে যুক্ত লোকেদের সাক্ষ্য নিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন কে জমি চাষ করে। পুরনো দলিলকে অগ্রাহ্য করে আইনের সাহায্যে এইভাবে ভূমিহীন কৃষককে জমির দখলীস্বত্ব পাওয়ানোর প্রচেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু সিদ্ধার্থ কংগ্রেস ফিরে এলে দেখে দেখে সেইসব সাক্ষ্যদানকারীদের মিশায় আটক করতে থাকে এবং তাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার চলতে থাকে। ফলে ১৯৭৭ সালে খুব সাধারণভাবেই বাম জমানার প্রত্যাবর্তনে জেল থেকে মুক্তি পাওয়া মানুষগুলো স্বস্তিতে ছিলেন না। এমতাবস্থায় দল উপলব্ধি করে বিশ্বাস ফিরে পেতে গেলে চাই বর্গাকরণ যার ফসল ফলবে দীর্ঘকালীন শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বিনয় চৌধুরি মহাশয়ের উপস্থিতি ও দলের ভাবনায় চালু হল অপারেশন বর্গা। মাঠে ঘাটে শুনানি শুরু হল, একদল রেভিনিউ অফিসার প্রথমদিন বর্গাদার ও মালিকের সামনে জমি বর্গা রেকর্ড করবে, দ্বিতীয়দিন মালিকের আপত্তি থাকলে মাঠে শুনানি, তৃতীয় দিন সার্টিফিকেট দিয়ে ক্যাম্প চলে যাবে

অন্যত্র। এই পদ্ধতিতে নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুল্যায়ন অনুযায়ী কুড়ি থেকে বাইশ লক্ষ বর্গাদার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দেখা যায় ১৯৮২ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত ১৪–১৫ লক্ষ নথিভুক্ত বর্গাদার হওয়ার পর প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই থেমে যায়।[§§] এইভাবে সরকারে থাকার বাধ্যতা জনগণের কাছে মান্যতা পেতে শুরু করে। শাপে বর হয়ে দাঁড়ায় নকশাল আন্দোলনের সময় অত্যাচারের কাহিনী, যা নাকি দল ও কংগ্রেস পুলিশের যৌথ সংগতের ফল, তা শুধুমাত্র সিদ্ধার্থের বিষফল বলে জনগণকে অতীতে এবং নিকট বর্তমানে গেলানো। আইএএস সংখ্যাতত্ত্ববিদ ড. সত্যব্রত সেন কিন্তু নির্বাচনে জিতে এসে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট মসনদে আসীন হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই একটা বোমা ফাটান। তাঁর গবেষণা দেখায়, সাত শতাংশ লোক যারা পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হয়েছে তারা বর্গাদার ক্ষেতমজুর, বাকি তিরানব্বই শতাংশই জমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এরপর সত্যব্রতবাবুর এখানে থাকার অসুবিধা হয়ে গেল। উনি কেরালায় পাড়ি দিতে বাধ্য হন। গ্রামসভা থেকে পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর যেটা কেরালায় বাম জমানায় ঘটেছে তা ওনারই পরিকল্পনার রাজনৈতিক রূপ। অর্থাৎ কিনা শ্রেণী সমঝোতাই ছিল বামফ্রন্টের দীর্ঘ শাসনের মূলমন্ত্র।

কিন্তু বাস্তবে বর্তমানের কৃষিক্ষেত্রের চিত্রটা পশ্চিমবঙ্গে নৈরাশ্যজনক। ভূমিহীন কৃষক কৃষিমজুর হিসেবে সারা বছর কাজ ও ন্যায্য মজুরি পায় না। ফসলের দাম, সংরক্ষণের সুবিধা না পাওয়া, চাষের খরচ বেড়ে চলা, কৃষিঋণের অভাব — এর ফলে প্রান্তিক চাষীরা ক্রমাগত লোকসানের মুখে পড়তে থাকে। এর একটা বড়ো কারণ হল গ্রামবাঙলায় ক্ষমতাশালী নয়া জোতদার মহাজনশ্রেণীর উত্থান। দাদন প্রথায় এ বঙ্গ রমরম করছে, কীটনাশক ধার দিয়ে সুদ নেওয়া হচ্ছে। এমনকি শিক্ষক আইনজীবী, এরাও আজ ভুঁইফোড় মহাজন। গবেষক অজিতনারায়ণ বসু রাজ্য সরকারের পরিসংখ্যান থেকে দেখিয়েছেন, ১৯৭১ সালের ৩৩ লক্ষ্ থেকে ১৯৯১ সালে বেড়ে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ৫১ লক্ষ হয়েছে, যা আজ ৮০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত মানব উন্নয়ন রিপোর্টে (সন ২০০৪) দেখানো হয়েছে, ভূমি সংস্কারের পর থেকে উচ্ছেদ হওয়া বর্গাদারের সংখ্যা ১৪.৩৭ শতাংশ, যা পাট্টাদারের ক্ষেত্রে ১৩.২৩ শতাংশ। উচ্ছেদের কারণ অবশ্য 'চাষ অলাভজনক' বলে চেপে যাওয়া হয়েছে। ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি ধনতন্ত্রের বিকাশের লক্ষণ নয়, এই প্রবণতা বহু দশকের, যা আজ তীব্র আকার নিয়েছে। এরপর আসা যাক খাদ্য উৎপাদনে, নিজের স্থান নিজে নির্ণয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম। কিন্তু পরিসংখ্যান বলে দেয়, ৩.৬৭ কোটি টন শস্য উৎপাদন করে উত্তরপ্রদেশ প্রথম স্থানে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের স্থান চতুর্থ। এখনও টন টন খাদ্যশস্য মাছ অন্য জায়গা থেকে আসে। অন্ধ্রের চালানি পোনা তো বাঙালির রসনায় অতৃপ্তির অবশ্যম্ভাবিতা। নাতিদূর ভবিষ্যতে খাদ্যশস্যের জন্য হা পিত্যেশ করে বসে থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই। কারণ 'সেজ'গুলো যখন কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পায়, তখন ড. স্বামীনাথনের সভাপতিত্বে চাষীদের জন্য গঠিত জাতীয় কমিশন তীব্র বিরোধিতা করেছিল। রাখঢাক না রেখেই কমিশন বলেছিল, উৎকৃষ্ট চাষের জমি 'সেজ'-এর জন্য দেওয়া যাবে না। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, মাথাপিছু খাদ্যশস্যের প্রাপ্তিযোগ্যতা সহ কৃষি উৎপাদনের হার ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় যা ছিল, তার চেয়ে এখন অনেক কম। সরকার পরিষ্কার বুঝে গেছে, ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার রাজনীতি এবং উল্লেখযোগ্য কৃষক আন্দোলনের অনুপস্থিতিতে ক্ষমতায় থাকার স্বার্থে শ্রেণী সমঝোতার দ্বারা রামসুক তেওয়ারীর উদরের মতো ফোলানো ফাঁপানো ভূমিসংস্কার আর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নতুন কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। তাই 'কৃষি আমাদের ভিত্তি শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ' এই আফিম। লেনিন তার 'পিজেন্ট ওয়র ইন জার্মানি' রচনায় দেখিয়েছেন, বড়ো শিল্পের হাতছানির ফলে রাষ্ট্রের আগ্রাসন কৃষক ও তার জীবন–জীবিকার ওপর কুঠার আঘাত হেনেছিল, সংগঠিত হয়েছিল নির্মম গণহত্যা। এই ছবিটার একটা উল্টোপিঠও ছিল, যা 'মর্ডান টাইম্স' ছবিতে চার্লস চ্যাপলিন চিত্রায়িত করেছিলেন — ভেড়ার পালের মতো অগুন্তি শ্রমিক পশ্চিম ইউরোপের শ্রমনিবিড় কারখানাগুলো থেকে নিঃসরণের। এই ঘটনা এনক্লোজার মুভমেন্ট বলে ইতিহাস খ্যাত। আজ এই মুহূর্তে সেই বিস্মৃত বিগতদিনের ছবি বর্তমানের ইজেলে আর আঁকা সম্ভব নয়। ওই ছবিতেই তিনি ভবিষ্যত কারখানার ভবিতব্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। মন্দা বাজারের কারণে ইতিমধ্যেই ছাপ্পান্ন হাজার কারখানা পশ্চিমবঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়েছে। কে বলতে পারে নন্দীগ্রামের জেলিংহামের মতো নতুন শিল্পের মৃত্যু জন্মের আগেই বা পরে আসন্ন নয়। যেখানে পুঁজির অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বে বাজারের চনমনে ভাব বিশ্বব্যাপী মন্দা। অর্থাৎ পুঁজিনিবিড় শিল্পে চাকরির সম্ভাবনা সামান্যই, তাই বাজার পাবার আশাও দুরাশা। এর বিপরীতে চল্লিশ শতাংশ গ্রামীণ কর্মী নিয়ে অন্য একটা পশ্চিমবঙ্গ আছে যা সরকারি মদতে লালিত নয়। এই অসংগঠিত বাজারের মূল্য বৎসরে কুড়ি হাজার কোটি টাকা। সকালবেলায় বাড়ি বাড়ি কাগজ দেওয়া থেকে শুরু করে দুধ, শাক–সব্জি, ফল, ফুল, মাংস বিক্রি, রেলের হকার, মুদিখানার জিনিসপত্র বিক্রি, মফস্বলে শহরে ফুটপাতে জামাকাপড়, অস্থায়ী গ্রাম্য হাটে হরেকরকম মণিহারি জিনিসপত্র কেনাবেচা সবই ওই শিল্পের অন্তর্গত এবং যা আমরা চোখে দেখতে পাই। যেটা দেখতে পাই না সেটা সম্ভবত আরও বড়ো প্রক্রিয়া, ক্ষেতখামার বা ছোটশিল্পের উৎপাদকের উৎপাদন — সংগ্রহ ঝাড়াই বাছাই প্যাকেজিং লেবেলিং কিংবা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের পর তা বিক্রেতাদের কাছে আসা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই থাকে প্রচুর খেটে খাওয়া মানুষ। চলতি সংগ্রহ–পরিবহণ–প্রক্রিয়াকরণ–সরবরাহ, এই শৃঙ্খলাটা বর্তমানে ভয়ানক বিপদের মুখোমুখি। বিপুল এই বাজার ধরতে জেলায় জেলায় হাজির দেশি রিলায়েন্স, বিদেশি ওয়ালমার্ট, স্পেনসার, মেট্রো, ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি (জার্মানি)। অর্থাৎ শ্রমনিবিড় ক্ষুদ্র বাণিজ্যের সংহারে উদ্যত নব্য উপনিবেশিক এজেন্ট সরকার, যার সহায়তা ছাড়াই উক্ত ক্ষেত্রে জীবিকা নির্বাহ করত লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাহলে এই বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কৃষক উচ্ছেদ কার হিতে? মস্তিষ্কে কিলবিল করতে থাকা হাজারো কেন–র উত্তর খোঁজা যাক।

বিশ্বব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে 'কান্ট্রি স্ট্র্যাটেজি ফর ইন্ডিয়া ২০০২–২০০৪' নামে যে দলিল প্রকাশ করা হয়, সেখানে সরাসরি পলিসিগত ভাবে যুক্ত করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বারোটি রাজ্যকে।

[§§] *মন্থন সাময়িকী, SEZ–বিষয়ক সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৭, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।*

অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার তার অন্তর্ভুক্ত। এই স্ট্র্যাটেজির নির্দেশমতো কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে অনেক অঙ্গরাজ্যই একটা মৌ সই করে (Medium Term Fiscal Reform Programme, Govt. of India)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৬শে মার্চ ২০০৩ তারিখে ভারত সরকারের সাথে এই মৌ সই করেছে। এই মৌ সরাসরিভাবে বিশ্বব্যাঙ্কের উপরিউক্ত দলিলটির সাথে যুক্ত, একথা এডিবি খোলাখুলিভাবে জানিয়েছে। সাম্প্রতিক শিল্পায়ন ওই দলিলটির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিশ্বব্যাঙ্কের ওই দলিলটি জানাচ্ছে, "... ১৯৯৭ সালে কান্ট্রি স্ট্র্যাটেজি গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকারগুলিকে সুসংহত সংস্কার (পড়ুন কাঠামোগত সংস্কার প্রোগ্রাম) গ্রহণে, উদ্দেশ্য হল পরিবর্তনপন্থী নেতাদের রাজ্যে সামনের সারিতে আনার সুযোগ দেওয়া এবং রাজ্যস্তরে সংস্কার প্রক্রিয়াতে বিশ্বব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে অনুঘটকের ভূমিকা নেওয়া। ব্যাঙ্কগোষ্ঠীর রণনীতি হবে রাজ্যগুলিকে একান্তভাবে সংস্কারভিত্তিক করে তোলা ...।" সঙ্গে সঙ্গে এও বলা হচ্ছে, "সরকার পক্ষ থেকে দুর্বারগতি সংস্কারের প্রয়াসের সাথে সাথে প্রয়োজন হবে ব্যক্তি মালিকানাধীন পুঁজিকে উৎসাহিত করা, যা স্থায়ী বিকাশের জন্য জরুরি। কাঠামোগত সংস্কারকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চাবিকাঠিগুলির মূল ক্ষেত্র হবে বিদ্যুৎ, কৃষি এবং ফ্যাক্টর মার্কেট — বিশেষত শ্রম এবং জমি।" যারা স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্টের কাজে ঢিলে দিয়েছে বা তা বন্ধ করেছে, তাদের তৎক্ষণাৎ ঋণ বন্ধ করে দেওয়া হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিষেবা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, শিল্প ও কৃষি কর্মসূচী তথা সর্বক্ষেত্রের জন্য বামফ্রন্ট সরকার বিশ্বব্যাঙ্ক ও তার সহযোগী সংস্থাগুলি থেকে যে সাহায্য পেয়ে চলেছে, তা বিশ্বায়নী স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রোগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাবার শর্তাধীন। এমনকি মন্ত্রীসভায় নতুন মুখও একধরনের অ্যাডজাস্টমেন্ট। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রদেয় সুদের পরিমাণ ৬২ শতাংশ, হ্যাঁ সরকারি বাৎসরিক রেভিনিউ এর ৬২ শতাংশ। সরকারি চাকুরেদের মাইনে ও অন্যান্য খরচ বাঁচিয়ে মানুষের জন্য পড়ে থাকে আয়ের পাঁচ থেকে দশ শতাংশ। এমতাবস্থায় ভয়ঙ্কর সংস্কারের নামে জমি থেকে কৃষক উৎখাত, তথাকথিত শিল্পায়ন, শ্রমিক আন্দোলন বন্ধ করা, সর্বত্র শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা কমানো, বেসরকারিকরণ ইত্যাদি ইত্যাদি, নাহলেই ঋণ বন্ধ। তাই অবশ্যম্ভাবী আকাশ, নদী, মাটি, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম বিকোনো। 'মুক্তি ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে?' মুক্তিপথ নির্দিষ্ট আছে কেতাবে, এখন শুধু প্রয়োগে কাগজের পাতা থেকে রক্তকরবীর রাজা সেজে বেরিয়ে আসা।

নাহলে? গণহত্যা। শাক দিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ ঢাকার চেষ্টা। ব্যর্থ হয়ে আবার গণহত্যা এবং জনগণের মান্যতা হারানো।

খুব অদ্ভুতভাবেই ক্যাডার-পুলিশ-জমি আঁকড়ে ধরা মানুষগুলোর গৃহযুদ্ধের ফাঁক দিয়ে পুঁজিবাদ গলে বেড়িয়ে দূরে মিলিয়ে যায়। সব্বাই দোষে ছিঃ এম বা ছিঃ পিএমকে।

তথ্যসূত্র :

ব্যবহৃত পরিসংখ্যানগুলি 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক সৌম্য চক্রবর্তীর ডিসেম্বর ২০০৬ থেকে এপ্রিল ২০০৭ অবধি লেখা প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।

চিঠিপত্র

বিষয় : নন্দীগ্রাম-খেজুরিতে সেনা তলবের আহ্বান

আড়াই মাস ধরে নিজেদের এলাকা নিজেদের দখলে রেখে, প্রশাসন ও হার্মাদবাহিনীর সাথে রীতিমতো যুদ্ধ করে 'সেজ'-এর অভিশাপমুক্ত হবার পরেও নন্দীগ্রামে শান্তি ফেরে নি। এ খবর নতুন নয়। শান্তি ফিরবে কীভাবে? একদিকে আছে ত্রাণের রাজনীতির মধ্যে দিয়ে রাজনীতির ত্রাণের উদ্যোগ। এ আড়াই মাস নন্দীগ্রামে কোনো রাজনৈতিক পতাকা উড়তে পারেনি যে! আছে ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরানোর তোড়জোড়। আছে সেখানে 'আইনের শাসন' লাগু করার ব্যাকুলতা। অপরদিকে প্রতিরোধকারীদের তরফে আছে ন্যায্যতার দাবি, ১৪ মার্চ হত্যাকাণ্ডের দোষীদের শাস্তি চাই। আছে একটি সফল গণপ্রতিরোধ সংঘটিত করার ফলে তৈরি হওয়া সামাজিক ঔদ্ধত্য, যা পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিকে সহজে মেনে নিতে চায় না। আর তাই 'পুলিশ প্রশাসন'-এর তরফেও আছে এই ঔদ্ধত্যকে গুঁড়িয়ে দেবার চিরকালীন আকাঙ্ক্ষা। এক আকাশে দুটো চাঁদ থাকে কি করে! তাই চাই সমাধান।

তা সমাধান প্রক্রিয়া চলছিল। বিভিন্ন পর্যায়ের সর্বদলীয় বৈঠকের চেষ্টা ... এর মধ্যেই ২ মে হাজির হল এক নতুন সমাধান। তার কয়েকদিন আগে থেকেই বড়ো মিডিয়ায় চলছিল প্রথম পাতায় ছবি আর হেডলাইনের এক মিছিল। নন্দীগ্রামের মাটিতে বন্দুক হাতে মুখে কালো কাপড় ঢাকা সন্ত্রাসবাদীসুলভ চেহারার কয়েকটি ছবি। ভাঙাচোরা দোকান। বিশাল বড়ো বড়ো, প্রায় ছ'কলামের সব ছবি। আড়াই মাস ধরে চলা যুদ্ধের দিনগুলিতে এসব ছবি সচরাচর আসেনি। জানিনা, এ ক'দিন মিডিয়াকে জামাই আদরে ডেকে সাজিয়ে গুছিয়ে এইসব ছবি তোলা হয়েছিল কিনা। তবে দেখা গেল, পয়লা মে তারিখে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিবের এক রিপোর্ট অভূতপূর্ব মিডিয়া ফোকাস পেল। কেন? তাতে নাকি শাসক পার্টিকেও সন্ত্রাসের দায়ে দায়ী করা হয়েছে। বাস্তবে অবশ্য রিপোর্টটিতে আগাপাশতলা প্রতিরোধ কমিটিকে তুলোধোনা করা হয়েছে। মাঝে কেবল ২টি পয়েন্টে শাসকদলের কথা পরোক্ষে এসেছে। দেখা গেল ২ মে রাজ্যের বিরোধী নেত্রী রাজ্যপালের সাথে দেখা করে নন্দীগ্রাম-খেজুরিতে সামরিক বাহিনী নামানোর আর খেজুরিকে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণার দাবি জানিয়ে এলেন। হঠাৎই, সমাধান প্রয়াসে। ৩ তারিখ, এতাবৎকাল বিরোধী নেত্রীকে খোরাক বানিয়ে তোলা, কর্পোরেট শিল্পায়নের পক্ষে সবচেয়ে সৃষ্টিশীল জনমত গঠনকারী সবচেয়ে বড়ো বাংলা মিডিয়া আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় লিখে সেই দাবিদুটিকেই তুলে ধরল : "প্রয়োজন তৃতীয় পক্ষ"। উপলক্ষ বেআইনি অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা।

এ কি সমাপতন?

আবার, জুনের তৃতীয় সপ্তাহে, বড়ো মিডিয়ায় সেই একই ধরনের ছবি, আতঙ্কগ্রস্ত বাচ্চার অর্ধেক পাতাজোড়া মুখ ... আর তারপরেই আবার আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় আহ্বান : এবার সরাসরি, সেনাবাহিনী নামানো হোক।

সবাই জানে, কেন্দ্রীয় বাহিনী মানে সামরিক বাহিনী। আর সে সামরিক বাহিনী ভারতীয় রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর ভারতীয় রাষ্ট্র সামগ্রিক ভাবেই 'সেজ' তথা কর্পোরেট শিল্পায়নকেই প্রমোট করছে। প্রমোট করছে যথেচ্ছ জমি অধিগ্রহণকে, জমি অধিগ্রহণের ব্রিটিশ আইনকে হাতিয়ার করে।

... শেষাংশ ১০ পৃষ্ঠায়

ওরা চাষ-ই করে

পি সাইনাথ

২৪ মে ২০০৭ 'দি হিন্দু' পত্রিকায় পি সাইনাথের লেখা **Farming --- it's what they do** *পড়ে জানতে পারলাম বিদর্ভের কলাবতী বান্দরকর কীভাবে লড়াই করে তাঁর একটা বড়ো সংসার চালাচ্ছেন। তাঁর স্বামী চাষ করতেন, অথচ নিজের নামে জমি না থাকার দরুন তিনি ফসলের (তুলো) দাম না পেয়ে ঋণভারে জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনাকে কৃষিসংকট জনিত আত্মহত্যা বলা হয়নি এবং এক পয়সাও সাহায্য দেয়নি সরকার। সাইনাথের প্রতিবেদনটি হুবহু অনুবাদ করে দেওয়া হল।*

আমি যখন প্রতিবেদনটি পড়েছি তখন আমার ছোটোবেলার কথা অর্থাৎ ৩৫-৩৬ বছর আগেকার কথা মনে পড়েছে। আমার বাড়ি নদীয়া জেলার তেহট্ট-এ। সেটা তখন একেবারেই গ্রাম ছিল। আমাদের পাড়ার পাশেই ছিল মালোপাড়া। সেখানকার দুলালিদি, আমড়াতলী মাসি, ঈশানিদি — এরা সবাই টুকুই করে মাছ বিক্রি করত বাজারে। জলঙ্গী নদীর মাছ। এরা সবাই বিধবা ছিল। নিজের সংসার চালানোর জন্য এরা মাছ বিক্রি করত, মাঠ থেকে গোবর কুড়িয়ে এনে ঘুঁটে দিয়ে বিক্রি করত। আর ইন্দুর মা তো মাঠে গিয়ে নিড়ানো,, বীজ লাগানো এইসব কাজও করত। আমরা তখন পড়াশোনা করতাম,, ঐ মালোপাড়ার মেয়েরাই ঢেঁকিতে ধান ভানত,, চিঁড়ে কুটত। লোকের বাড়ি থেকে ধান চেয়ে নিয়ে গিয়ে নিজেরা সেদ্ধ করে, তারপর শুকনো করে ধান ভেনে চাল করে দিয়ে যেত।, তার থেকে নিজেরা খানিকটা পেত। আবার কেউ কেউ মুড়ি ভেজে দিত। এইভাবে তারা সংসার চালাত। যাদের স্বামী ছিল, তারাও অভাবের সংসার চালানোর জন্য এই সব কাজ করত। আসলে তাদের বেশির ভাগেরই কোন নিজস্ব জমি ছিল না, বা থাকলেও খুবই কম। তাই সংসারে সকলের পেট ভরাতে সকলকেই এই ধরনের কাজ করতে হত। অবশ্য তখন সমাজের চেহারাটা আলাদা ছিল। তারপর আস্তে আস্তে কৃষিতে উন্নত মানের বীজ, সার ব্যবহার শুরু হল, জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি হল,, এইভাবে কৃষিতে শিল্পায়ন শুরু হল। আর এখন তো কৃষির জায়গায় শিল্প করা হচ্ছে, কৃষিজমিতে কারখানা বানানো হচ্ছে ব্যাপক হারে। বাজারের ফাঁসে পড়ে কৃষিও নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে ফসলের দামের ওপর। আর যারা ক্ষেতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত, তারা জমি হারিয়ে বা জমির কাজ হারিয়ে বা ফসলের দাম না পেয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। ফলে তাদের অনেকেই আত্মহত্যা করছে।

পুঁজির আগ্রাসী আক্রমণ এবং সংকটের মধ্যেই বাঁচারও একটা জায়গা নিজেদের জোরে তৈরি করে নেওয়া যায়, তৈরি করে নিতে হয়, বিদর্ভের কলাবতীর লড়াইয়ের এই অদম্য মনোবলের উৎসের কথা ভাবতে গিয়ে মনে পড়ে গেল আমার ছোটবেলার গ্রামের কথা। — অনুবাদ ও ভূমিকা মণিদীপা ভৌমিক।

কলাবতী বান্দরকরের নিজের হাতে তাঁর পাঁচ নাতি-নাতনি ভূমিষ্ঠ হয়েছে — তিনি তাঁর মেয়েদের প্রসব করিয়েছেন নিজের ঘরে। তাঁর বিবাহিত সব মেয়েরাই তাঁরই মতো গরিব — হাসপাতালে গিয়ে পয়সা খরচ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ধাত্রীর ভূমিকা তাঁকেই নিতে হয়েছে। আমরা যখন ওখানে যাই তখন তাদের ঘরে দশ জন বাসিন্দা। এদের সবাইকে দেখভাল করার পাশাপাশি তিনি নয় একরের এক 'বিফল' কৃষিখামার পরিচালনা করেন এবং অন্যের জমিতে কাজ করে দিনে ৩০ টাকা রোজগার করেন। এখন চাষের মরশুম নয়, তাই জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে তা বিক্রি করে দিনে আয় হয় কুড়ি টাকা। তাঁর সর্বশেষ আয়ের উৎস নিজেদের একটা মোষ যার দুধ বিক্রি করে পয়সা আসে।

তিনি জানান, তাঁর চতুর্থ মেয়েটার নিখরচায় একটা বিয়ের ব্যবস্থা তিনি করেছেন। এবং এখন কমসম খরচে তাঁর পঞ্চম মেয়েটার বিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। কলাবতীর সাত মেয়ে ও দুই ছেলে। তিনি থাকেন বিদর্ভের যাবাৎমল জেলার জালকা গ্রামে। গত ১৪ বছরে দেশজুড়ে কৃষক আত্মহত্যার জন্য যে লক্ষাধিক মহিলা চাষী তাদের স্বামীদের হারিয়েছে, কলাবতী তাদেরই একজন।

ক্ষতিপূরণ নেই

ঘটনাক্রমে দিদিমা, সদাহাস্যময়ী কলাবতী জানান, "সরকারের থেকে কখনও আমি একটা পয়সাও ক্ষতিপূরণ পাইনি।" কারণ, যে জমি তাঁরা চাষ করেন তা তাঁদের নিজেদের নয়, অন্যের থেকে লিজ নেওয়া। তাই তাঁর স্বামী পরশুরাম ঋণের ভার ও ফসল নষ্ট হওয়ার জ্বালা সইতে না পেরে যখন আত্মহত্যা করেন, তখন তাকে 'কৃষকের আত্মহত্যা' বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। সরকারি বক্তব্য : 'যার নামে কোন জমি নেই সে চাষী নয়।' যদিও তাঁদের পরিবার 'বিদর্ভ জন আন্দোলন সমিতি'র কাছ থেকে সামান্য কিছু সাহায্য পেয়েছিল।

৫০,০০০ টাকার ওপরে ঋণ মাথায় নিয়ে পরশুরাম বাধ্য হয়েছিল কলাবতীর মঙ্গলসূত্রটাকেও বন্ধক দিতে। "এছাড়া সে আর কী করতে পারত?" কৃষি সংকট তাদের সমস্ত খরচ খরচাও বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই মূল্যবৃদ্ধিতে তাদের অবশ্য তেমন লাভ হয় নি — তাদের নয় একর জমিতে ফলন হয়েছিল চার কুইন্টাল এবং তাতে ৭০০০ টাকা এসেছিল। যেদিন এই তুলো বিক্রির টাকা হাতে এল, সেদিনই পরশুরাম তার বউয়ের মঙ্গলসূত্র ফেরত নিয়ে এল এবং মাঠে গিয়ে আত্মহত্যা করল। কলাবতী আগেও তাঁর পরিবারের জন্য উপার্জন করতেন। তাই ঠিক করলেন, এবার তিনি একাই চালিয়ে নিয়ে যাবেন। মুখে আত্ম-বেদনার কোনও চিহ্ন না রেখে কলাবতী বলেন, "আমরা চাষের কাজ করি, আমরা এই কাজই করব।" তিনি কাজ করেছেন এবং তাঁর স্বামীর ঋণের প্রায় সবটাই শোধ করে দিয়েছেন। স্থানীয় এক মহাজনের সাথে মীমাংসায় সুদ ছাড় পেয়ে তিনি ঋণ শোধ করেছেন। "এখন শুধু আমাদের আত্মীয়দের কাছে ১৫,০০০ টাকা ধার আছে, এর জন্য অবশ্য কোন সুদের ব্যাপার নেই" — তিনি জানান।

তিনি বলেন, "না, আমি কোন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য নই। ওরা যে মাসিক ২০ টাকা চাঁদা নেয় তা দেওয়ার সামর্থ্য আমার নেই।" তাঁর মেয়েদের চারজন বিবাহিত। পরশুরামের আত্মহত্যার আগেই তিনজনের বিয়ে হয়। একজনকে স্বামীর বাড়িতে নেয় না, সে এই বাড়িতে ফিরে এসেছে। আর তিনজন বাচ্চা হওয়ার জন্য তাঁর কাছে এসে আছে। তিনি বলেন, "আমার বড়ো মেয়ে মালথা আর আমি — এই দুজন শুধু সংসারের উপার্জনকারী সদস্য।" কাঠ কুড়িয়ে ভয়ানক পরিশ্রম করে দুজনে এখন দিনে ৪০ টাকা রোজগার করে।

মোষের দুধ থেকে বাকি যা আয় — "দিনে ৬০ থেকে ৮০ টাকা, কখনও একটু বেশি।" এই আয়ের ওপরই ১০ জন মানুষ বেঁচে আছে। মালথা সবচেয়ে বড়ো, বয়স পঁচিশ। সবচেয়ে ছোটো চৈতন্যের বয়স আট। এত কষ্টের মধ্যেও মুখে হাসি, বাচ্চারা হৈ হৈ করছে, তাদের সামাল দিচ্ছে প্রাণোচ্ছল যুবতীরা। অবশ্যই কলাবতীর বাচ্চারা অনেকদিন আগেই স্কুল ছেড়ে দিয়েছে।

কলাবতী নিজে অবশ্য মোষের দেখভাল করেন না। "তাহলে যা আয় করি তা কমে যাবে।" তার বদলে একজন রাখাল আছে। তাকে মাসে ৪০ টাকা, অর্থাৎ দিনে ২ টাকারও কম দিতে হয়। "সে অনেক গরু মোষের সাথে আমারটাকেও দেখে। আমি তার সাথে গোবর ভাগ করে নিই।"

ভঙ্গুর ব্যবস্থা

এই মোষটা এই পরিবারই কিনে এনেছিল। এটা সরকারের সেই কিম্ভুত পরিকল্পনার অঙ্গ নয়, যাতে বহু ছোটো চাষীকে দামী গরু দিয়ে নিঃস্ব করা হয়েছে — ওই গরুগুলো ছোটো চাষীরা চায়ওনি এবং ওগুলোকে তারা খাওয়াতেও পারেনি। এ পর্যন্ত কলাবতীর ব্যবস্থাটা, ভঙ্গুর হলেও কাজ করে যাচ্ছে। মোষটার কোন ক্ষতি হলে পরিবারটার অর্থনীতি তছনছ হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে, "আমরা সবটা দুধ বিক্রি করি।" এমনকি বাড়ির বাচ্চারাও এই দুধের একফোঁটা পায় না। ঘরের দুটো মেয়ে এখনও কোন কাজে লাগতে পারছে না, কারণ তাদের সবেমাত্র বাচ্চা হয়েছে। কলাবতী বলেন, "আমাদের পঞ্চম মেয়ে, ললিতার জন্য আমরা একটা ভালো সম্বন্ধ পেয়েছি। পাত্রের পরিবার আমাদের অবস্থা দেখে কোনো টাকা-পয়সা চায়নি। কিন্তু আমরা যাতে লোক খাওয়ানোর একটা ব্যবস্থা করি তারা সেটা চায়। এখানে না হলে ওদের ওখানেও খাওয়ানো যায় — তবে তাতে খরচ বেশি। আমাদের অবশ্য কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে।" সম্ভবত ব্যবস্থা তিনি করে ফেলবেন। পরশুরাম বেঁচে থাকতেও, দুই মেয়ে সুনীতা ও সবিতার একদিনে এক প্যান্ডেলের তলায় বিয়ের ব্যবস্থা তো তিনিই করেছিলেন। কারণ, "মালথার বিয়েতে এক লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যাওয়ায় আমাদের খরচ কমানোর জন্য কিছু একটা করতেই হত।"

চাষী বলে স্বীকৃতি না পাওয়ায় এবং তার ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় তিনি বিরক্ত। "আমাদের অবশ্য চন্দ্রপুর জেলায় ৩.৫ একর জমি আছে", তিনি বলেন, "কিন্তু সে জমি আমার বাবা-মা-র নামে। আমাদের নাম এখনও সে জমিতে নথিভুক্ত হয়নি। এখানে আমরা এই নয় একর জমির লিজ নিয়েছি বছরে মাত্র দশ হাজার টাকার বিনিময়ে, টাকার পরিমাণেই বুঝতে পারছেন জমির হালত কত খারাপ।" — তিনি হেসে ফেললেন। বুঝতে পারি, হিসেব মতো এরা 'চাষী' নয়। এই অবস্থায় চালিয়ে যাওয়া খুব কঠিন কাজ। কিন্তু কলাবতী নিরুদ্দম হয়ে সময় নষ্ট করেন না। তাঁর চিন্তার বিষয় — "এই 'পোলা' উৎসবের পর থেকে কাজ পাওয়া কঠিন হয়ে গেছে।" আর "চাষের জন্য খরচ বেড়ে যাচ্ছে, তুলো আর আমাদের জন্য নয়। আমাদের অন্য কিছু করতে হবে।"

কলাবতী এমন একজন মহিলা যিনি লড়াই করে বেঁচে আছেন এবং যিনি জোরের সাথে বলতে পারেন, তিনি চান তাঁর ছেলেপুলেরাও চাষের কাজ করুক। গ্রামে এটা খুবই ব্যতিক্রমী ঘটনা, কারণ সেখানকার মানুষ আজ প্রবলভাবে চাইছে যে তার সন্তান চাষের কাজ ছেড়ে অন্য কোন চাকরি করুক। কিন্তু কলাবতী তো পরের মরশুমে কী করবেন তার পরিকল্পনা করছেন এখন। বলছেন, "আমরা তো চাষ-ই করি, আর চাষেই থাকব।"

চিঠিপত্র

বিষয় : নন্দীগ্রাম

প্রিয় জিতেনবাবু,

গত ১লা বৈশাখ ১৪১৪ বড়তলা মোসলেম লাইব্রেরিতে 'মাটির কেল্লা' আয়োজিত বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের পর ওখানে আপনার সঙ্গে আমার যে কিছু কথা হয়, সেই প্রসঙ্গেই আমার এই চিঠি।

সমাজ নিশ্চল নিস্পন্দ নয়। নানা অঘটন-ঘটনের মধ্য দিয়েই সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি।

ক্রিয়াশীল এই প্রকরণের মধ্যে আজকের দিনে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম স্বার্থবাহী এক এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানরূপে তাদের উৎপাদন (Product) দিয়ে আমজনতার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা শব্দটি খেলো Product-এর মায়াবী বিজ্ঞাপনের মতো। সংবাদ যেন পণ্যে পরিণত। সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতা এক বালাই। বাজার-নীতির গড্ডালিকা প্রবাহে যেন ভেসে চলেছে সংবাদ জগৎ।

নামকরণ অনুসারে 'মন্থন' বলতে বুঝি 'মউনি' দিয়ে 'মওয়া' অর্থাৎ মন্থন দণ্ড দিয়ে মন্থন করা। আমার জন্মস্থান তৎকালীন পূজালী গ্রামের প্রান্তিক অনুন্নত অঞ্চল, যেখানে আজ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ওখানে শৈশবে দেখেছি আমার জননীকে দধি-মন্থন করতে। তাতে ভেসে উঠত দধিসার বা ননী; পড়ে থাকত ঘোল, ওটাও ফেলা যেত না, ব্যবহার হত জলমিশ্রিত উপাদেয় পানীয়রূপে।

পৌরাণিক সমুদ্র-মন্থনে নানা উপকরণের সঙ্গে উঠে এসেছিল একাধারে হলাহল, অন্যদিকে দেবভোগ্য অমৃত। মন্থনদণ্ড মৈনাককে ঘোরাতে রজ্জুরূপে ব্যবহার করা হয়েছিল নাগরাজকে। ধূর্ত দেবতারা ধরেছিল নাগরাজের পুচ্ছের দিক, আর নির্বোধ অসুরদের ধরতে দেওয়া হয়েছিল মুখের দিক, যাতে তাদের অনেকেরই জীবনান্ত হয় সর্পরাজের বিষ-ক্ষরণে।

'মন্থন'-এর একজন গ্রাহক-পাঠক হিসাবে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে হচ্ছে 'মন্থন' পত্রিকার জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০৭, অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় আপনার সম্পাদকীয় মন্থনে যেন উঠে এসেছে নবনীর পরিবর্তে পৌরাণিক হলাহল ও দেবভোগ্য অমৃত। অসুরকুল সাধারণ নন্দীগ্রামবাসীর ভাগে পড়েছে হলাহল, আর দেবদেবীদের ভাগে পড়েছে অমৃত।

আপনার 'মন্থন' একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিন। এই শ্রেণীর ম্যাগাজিন একটি হরিণের মতো, মানুষ-খেকো বাঘের মতো বৃহৎ ব্যবসায়িক

সংবাদপত্র বা পত্রিকা নয়। আপনার আবেগতাড়িত উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত সম্পাদকীয় যেন একচক্ষু হরিণের মতো ছুটছে একপাশে দৃষ্টি রেখে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের দিগ্‌দর্শনের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে।

খুন-জখম, রাস্তাকাটা, সেতুভাঙ্গা, ধারাবাহিক ব্যাপক লুঠতরাজ, জুলুমবাজি, তোলাআদায়, গৃহদাহ ইত্যাদি নারকীয় দস্যুবৃত্তিমুলক জঘন্য অসামাজিক ক্রিয়াকলাপকে উপেক্ষা করে বা পরোক্ষে ছাড়পত্র দিয়ে অশান্ত এলাকাকে মুক্তাঞ্চলের অভিধায় চিত্রিত করা হল আপনার পত্রিকায়। এটি কাদের মুক্তাঞ্চল? আমার এই প্রশ্নটি কি অবান্তর?

গণ-আন্দোলনের নামে গণ-আন্দোলনের ঐতিহ্যকে পদদলিত করে জানুয়ারি ২০০৭ থেকে ঘটিত এই মর্মান্তিক অঘটনাবলীরই একটি ধাপ ১৪ই মার্চের মর্মন্তুদ ঘটনা — পুলিশ অ্যাকশন, গণ-আন্দোলনের নেতা-নেত্রীদের প্রত্যাশা পূরণ। না হলে বোকাবাক্সের মুখোমুখিতে ওইদিন সন্ধ্যায় ওই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সহ-সভাপতির মুখ হাসি-হাসি খুশি-খুশি কেন? প্রত্যাশা পূরণের আনন্দোচ্ছ্বাসে তাইতে ভেঁপু বাজে, হুইসেল বাজে, সিটি বাজে, ঝাঁইঘন্টা বাজে, নাটকের মজা দেখানো হয় বিধানসভায়।

বিস্ময় লাগে বিশেষ শব্দ চয়নেও আপনাকে ঋণী হতে হল সেই অতিসাহসী কায়েমি ব্যবসায়িক স্বার্থবাদী পত্রিকার নিকট যেটি ভগবান ছাড়া কাউকেই নাকি ভয় করে না। একচক্ষু হরিণ নরখাদক শার্দুলের উদরে আত্মপ্রসাদ লাভ করে কিনা তা আমার অজানা।

আমার এই উপলব্ধিপত্রটি আপনার মার্চ-এপ্রিল ২০০৭ সংখ্যার জন্য দিলাম। ১৪ই মার্চের মর্মন্তুদ ঘটনা যখন আপনার পত্রিকার জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে, তখন আমার এই পত্রটি হয়ত অতি বিলম্বিত নয়।

৩রা মে ২০০৭

নিখিলরঞ্জন জোয়ারদার
বদরতলা, কাঞ্চনতলা
গার্ডেনরীচ, কলকাতা ৪৪

সম্পাদকের জবাব

শ্রদ্ধেয় নিখিলবাবু,

প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আপনার অকপট লেখনের জন্য। মার্চ-এপ্রিল ২০০৭ সংখ্যা বেরোনোর পরে ডাকে আপনার চিঠিটা আমাদের কাছে পৌঁছায়, তাই এই সংখ্যায় এটা ছাপা হল। আপনার চিঠি সম্পর্কে আমি কয়েকটা কথা বলব, যদি ভুল হয় নিশ্চয় ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

স্বীকার করে নিতে দ্বিধা নেই যে নন্দীগ্রামের ঘটনাতেও সবকিছু আমাদের নজরে আসেনি। যদিও সবকিছু কথাটারও হেঁয়ালি আছে। আমার কাছে যা সবকিছু, বাস্তবে তা তো কিছুকিছুই বটে। নন্দীগ্রামে সেই কিছুকিছুও যখন নজর করতে চেয়েছি, পেরে উঠিনি। ১৪ মার্চের ঘটনার তিনদিন পরে, ১৭ মার্চ নন্দীগ্রামের ১নং ব্লকের শেষপ্রান্তে তালপাটি খাল পর্যন্ত যেতে পেরেছিলাম, কিন্তু তারপর খালের ওপারে খেজুরিতে তো আজ পর্যন্ত যেতে পারিনি। অথচ আমাদের সমীক্ষার দিক থেকেই যাওয়ার খুব দরকার ছিল।

কিন্তু আজ অবধি নন্দীগ্রামের যতটুকু যা নজরে এসেছে, তা থেকে একটা বোধ গড়ে উঠেছে। নন্দীগ্রাম আচমকা ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনা নয়। ২০০৬ সাল থেকেই কতগুলো ঘটনা আমাদের সকলের নজরে এসেছে। বড়ো আকারে জমি অধিগ্রহণ করার বিরুদ্ধে স্থানীয় সমাজের ভিতর থেকে একটা প্রতিরোধ।

ওড়িশার কলিঙ্গনগরের ঘটনার বিবরণ তো এই পত্রিকায় কিছুটা ছাপা হয়েছে। ১৯৯০ সাল থেকে শুরু হয়েছে সেখানে জমি অধিগ্রহণের চেষ্টা আর তার প্রতিরোধও দীর্ঘস্থায়ী নানান পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের গঙ্গাভরমে বেসরকারি উদ্যোগে বিশাল বন্দর নির্মাণ করতে গেলে প্রতিরোধ করে সেখানকার মৎস্যজীবী সমাজ। মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে রিলায়েন্সের SEZ-বিরোধী প্রতিরোধের কথাও মন্থন-এ এসেছে। ট্রিডেন্ট গ্রুপের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কৃষক সমাজের প্রতিরোধ চলছে পাঞ্জাবের বার্নালায়। ওড়িশাতে জগৎসিংহপুর জেলায় পস্কো গোষ্ঠীর ইস্পাত প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সেখানকার আদিবাসী সমাজের প্রতিরোধ চলছে।

এগুলি কয়েকটি উদাহরণ। এরকম উদাহরণ আরও রয়েছে। এইসব প্রতিরোধের সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় দিক হল, এগুলি সবই স্থানীয় সমাজের নিজস্ব প্রতিরোধ। কোথাও তারা কৃষক, কোথাও মৎস্যজীবী, কোথাও আদিবাসী সমাজ। প্রতিরোধের গণচরিত্রই এগুলিতে রাজনৈতিক দলগুলিকে টেনে এনেছে, আরও নির্দিষ্টভাবে বললে স্থানীয় ভিত্তিতে বিরোধী দলগুলিকে।

বড়ো আকারে জমি অধিগ্রহণ করার বিষয়টি সামনে এসেছিল ২০০৬ সালে দেশজুড়ে SEZ-এর জন্য সরকারি অনুমোদন শুরু হওয়ার পর থেকে। তার আগে ২০০৫ সালে যখন কেন্দ্রীয় সরকার SEZ আইন তৈরি করল, তখন পার্লামেন্টে যৎসামান্য বিতর্ক ছাড়া রাজনৈতিক মহলে কোন কিছু শোনা যায়নি। তারও আগে আট বছর ধরে SEZ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের কাজ চলেছে। মহারাষ্ট্র, গুজরাত, অন্ধ্র, পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যভিত্তিক SEZ আইন তৈরির কাজ চলেছে। রাজনৈতিক দলগুলির তরফে কোন প্রতিবাদ বা আন্দোলন লক্ষ্য করা যায়নি। অর্থাৎ যেটা বলতে চাইছি, প্রতিরোধ আন্দোলনগুলি সমাজের ভিতর থেকে গড়ে উঠেছে, SEZ-এর বিরুদ্ধে নয়, বরং SEZ-এর জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে। নন্দীগ্রাম কি দেশজোড়া এই প্রতিরোধ-প্রক্রিয়ারই অঙ্গ নয়?

আমার উপলব্ধিতে নন্দীগ্রাম কেবল এই প্রতিরোধ-প্রক্রিয়ার অঙ্গই নয়, তার এমন এক মাত্রা, যেখানে রাষ্ট্রকে SEZ-এর জমি অধিগ্রহণের জন্য তার কর্মসূচীকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রত্যাহার করতে হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তি কীসের সূচক? এ কি স্থানীয় গণবিক্ষোভের স্বীকৃতি, অথবা নৈরাজ্যের কাছে মাথা নোয়ানো, না গণ-আন্দোলনের স্বীকৃতি? আমার কাছে তৃতীয়টাই মনে হয়েছে। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে এই মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

নন্দীগ্রামে ২০০৫ সাল থেকে এসইউসিআই আন্দোলনের চেষ্টা করেছে; ২০০৬ সালে নকশালপন্থী, জমিয়তে উলেমা হিন্দ ও তৃণমূল আলাদাভাবে উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু ততক্ষণ প্রতিরোধটা গড়ে ওঠেনি, যতক্ষণ না স্থানীয় সমাজ উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রতিরোধের মাহেন্দ্রক্ষণ,

তার পন্থা কোন রাজনৈতিক দলের নেতা ঠিক করে দেয়নি, স্থানীয় মানুষই তার রূপকার। এটুকু তো খোলাচোখেই দেখার চেষ্টা করেছি। দেখেছি, নন্দীগ্রামে তা একরকম, কলিঙ্গনগর গঙ্গাভরম রায়গড় বার্নালা জগৎসিংহপুরে ভিন্ন ভিন্ন রকম।

তবে এইসব গণবিক্ষোভে নেতৃত্ব দিতে চেয়েছে বিরোধী দলগুলি। কোথাও শিবসেনা, কোথাও সিপিআই-সিপিআইএম, কোথাও তৃণমুল কংগ্রেস বা অন্য কোন দল নেতৃত্বের আসন নিয়েছে। যেমন, গঙ্গাভরমে মৎস্যজীবীদের ওপর গুলি চালনার প্রতিবাদে ২৮ মার্চ ২০০৬ সিপিএম ও তেলেগু দেশম বন্‌ধ ডেকেছে; রায়গড়ে খেতকরী কামগর পার্টি ও সিপিএম SEZ-বিরোধী মোর্চা গঠন করেছে; আবার পশ্চিমবঙ্গে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে মোর্চা গড়েছে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও অন্যান্য সরকার বিরোধী বামদল/গোষ্ঠী। যে এনডিএ জোট সরকার ২০০০ সালে SEZ–এর প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল, তারই প্রধান শরিক বিজেপি গঙ্গাভরমে মৎস্যজীবীদের সমর্থন করেছে; তারই অপর শরিক শিবসেনা রায়গড়ের আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে; আর এক শরিক তৃণমূল কংগ্রেস তো পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলনের নেতৃত্বে। যে ইউপিএ সরকার SEZ আইন নিয়ে এসেছে, তারই মধ্যমণি কংগ্রেস দল পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলনের শরিক। এখানে লক্ষ্যণীয়, কোনও সর্বভারতীয় একক নীতির ভিত্তিতে নয়, এক ধরনের স্ব-বিরোধিতা নিয়েই সমাজের বিক্ষোভকে ভাষা দিতে চাইছে রাজনৈতিক দলগুলি।

আপনার চিঠিতে উল্লেখিত নেতা-নেত্রীদের প্রত্যাশা পূরণের টার্গেট বা বড়ো সংবাদমাধ্যমের স্বার্থের প্রশ্ন যথার্থ। কিন্তু তা দিয়ে কি আন্দোলনের বাস্তব অস্তিত্বকে খারিজ করে দেওয়া যায়? খারিজ হয় কি আন্দোলনের সারা দেশজোড়া পটভূমির অস্তিত্ব? আমার, আমার দেখার একপেশেমি নিয়ে আপনি নিশ্চয় বারবার বলবেন। না হলে কীসের মন্থন? কীসের সংলাপ? কেনই বা পত্রিকা প্রকাশ?

জিতেন নন্দী

সাচার রিপোর্টে নারী

মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায়

সাচার কমিটি নিয়ে এই মুহূর্তে ভারত তোলপাড়। ভারত সরকার নিয়োজিত এই কমিটি ভারতের মুসলমান সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থানের যে রিপোর্ট পেশ করেছে, তার প্রতিটি ছত্রে রয়েছে এক বিপুল বঞ্চনার ইতিহাস। এই পৃষ্ঠভূমিতেই চোখে এল একটি প্রথম সারির পত্রিকার প্রচ্ছদ — কালো কাপড়ে ঢাকা নারী মুখের শুধু চোখদুটি দৃশ্যমান — মুসলমান মহিলাদের যে ছবিটিই বার বার নির্মিত ও পুনর্নির্মিত হচ্ছে চালু গণমাধ্যমে। মুসলমান সমাজের জ্বলন্ত দলিল সাচার রিপোর্ট কিন্তু আলো ফেলেছে অন্য এক ছবিতে। তথ্য প্রমাণ সমৃদ্ধ এই বিষয়টি আলোচনায় আসা জরুরি — যা প্রচলিত ধারণাকে অনেকটাই চ্যালেঞ্জ জানায়।

উচ্চ পর্যায়ের এই কমিটিতে কোন মহিলা সদস্য ছিলেন না। এই বাদ পড়াটা রাষ্ট্রীয় বিবেচনার একটা সাধারণ রূপ, বেশির ভাগ কমিটিতেই এটা ঘটে যায়। কিন্তু কমিটির চেয়ারপার্সন রাজিন্দর সাচার রিপোর্টের ভূমিকাতেই এই বাদ পড়া সম্পর্কে সচেতন থেকেছেন। তিনি জানিয়েছেন বিভিন্ন মহিলা সংগঠন তাঁদের কাছে এই অভিযোগ করেছে। কমিটি এই ঘাটতি পূরণে প্রয়াসী হয়ে বিভিন্ন রাজ্যে তাদের পরিভ্রমণের সময় বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের সাথে কথা বলেছে। সেখানে মহিলা সমাজকর্মীরা খোলাখুলি তাদের বক্তব্য জানিয়েছেন। এছাড়া ২০০৬ সালের জুলাইতে সারা দেশ থেকে আগত মহিলাদের সাথে কমিটি একদিনের একটি বৈঠক করেছে।

রিপোর্টের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পরিচয় ও লিঙ্গ (Identity and Gender) শীর্ষক অনুচ্ছেদে অত্যন্ত মূল্যবান কিছু অবলোকন আছে। সাধারণভাবে যে কোনো পশ্চাদপদ গোষ্ঠীর মেয়েদের আরও বেশি পশ্চাদপদতার জন্য সেই গোষ্ঠীকেই দায়ী করা হয়। মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই দোষারোপটি ভয়ঙ্কর মাত্রায়। কমিটি লক্ষ্য করেছে, মুসলমান মহিলা সংক্রান্ত কিছু কিছু ঘটনা বারবার সংবাদমাধ্যম এমনভাবে আলোচনায় আনছে যে এই ধারণা তৈরি হচ্ছে যেন এই সম্প্রদায়ের লিঙ্গ-বৈষম্যের মূল কারণ তাদের ধর্মমত। ফলে নাগরিক সমাজ এবং রাষ্ট্র উভয়েই, বঞ্চনার মূলে যে সামাজিক বৈষম্য এবং ত্রুটিপূর্ণ উন্নয়ন নীতি সেদিকে নজর না দিয়ে, কারণগুলি ধর্মীয় গোষ্ঠীগত পরিসরেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখানেই রাষ্ট্রের দায় শেষ — সম্প্রদায়কে দায়ী করেই সে খালাস।

কমিটির কথায়, যে কোন সম্প্রদায়ে মহিলারাই পরিচয়ের মশাল বহন করে। ফলে সম্প্রদায়গত পরিচয় বিপন্ন হলে মেয়েরাই সবচেয়ে পীড়িত হয়ে পড়ে। এমনিতেই স্বেচ্ছায় বা সামাজিক চাপে মহিলারাই সম্প্রদায়সূচক রীতিনীতি বেশি মেনে চলে। বহির্জগতে তাদের জীবন, নৈতিকতা চলাফেরা এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পাশাপাশি সম্প্রদায় হিসেবে নিরাপত্তাহীনতার ভয়ও তাদের বেশি। ফলে তাদের কাছে নিরাপদ এবং অ-নিরাপদ স্থানের সীমাটাও সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। আজকে ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি এমন যে বহু মুসলমান মহিলার কাছে নিরাপদ স্থান হল তার ঘর এবং গোষ্ঠীর সীমানা। বাইরের সবকিছুই — বাজার, রাস্তা, গলি বা সাধারণ যানবাহন, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, থানা, সরকারি দপ্তর সমস্তই বিপজ্জনক। যদিও বিভিন্ন আলোচনায় মেয়েরা কমিটিকে জানিয়েছে, শিক্ষা ও কাজের উপযুক্ত সুযোগ পেলে তারা এই সমস্যাগুলি নিজেরাই কাটিয়ে উঠবে।

সাচার কমিটি দেখেছে, পশ্চিমবঙ্গে ১০০০টিরও বেশি মুসলমান-প্রধান গ্রামে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। মুসলমান মহিলাদের সামগ্রিক শিক্ষাগত অবস্থানটিও সমস্যাসঙ্কুল। দারিদ্র্য, দূরের স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব, গ্রামীণ পশ্চাদপদ অংশে স্কুলের দুর্দশা, মেয়েদের পৃথক স্কুল না থাকা, মহিলা শিক্ষিকার অভাব, শিক্ষান্তে পেশায় প্রবেশের সম্ভাবনা কম থাকা — ইত্যাদি বহু কিছু এর জন্যে দায়ী। তবু কমিটি আশ্চর্য হয়ে দেখেছে, এই বিবর্ণ দৃশ্যপটে একটি উজ্জ্বল আশার কিরণ — শিক্ষাব্যবস্থা যখন আপাতভাবে মুসলমান মেয়েদের ব্যাপারটা ছেড়েই দিয়েছে, তখন

মেয়েরা কিন্তু লেখাপড়া ছাড়েনি। রাজ্যে রাজ্যে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার আগ্রহের প্রমাণ পেয়েছে কমিটি।

শিক্ষায় অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে যে কোন পশ্চাদপদ গোষ্ঠীরই মূল সমস্যা দারিদ্র্য। এটি নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রযোজ্য। সরকারি যে স্কুলগুলিতে এরা পড়তে যায়, সেগুলির গুণগত মান ভালো নয়। শিক্ষকদের অবহেলাও দেখা যায়। মুসলমান ছাত্রীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণও ঘটে। অর্থের অভাবে প্রাইভেট স্কুলে এরা পড়তে পায় না। তার ওপর নিরাপত্তার কারণে স্কুল দূরে থাকলে বাবা-মা পাঠায় না। কমিটি এ ব্যাপারে হোস্টেল ব্যবস্থার উন্নয়নের কথা বলেছে। আবার দেখা যাচ্ছে মেয়েদের উর্দু পড়ানোর দিকে আগ্রহ বেশি, যেহেতু যে কোন গোষ্ঠীতেই ঐতিহ্য বহনের দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে মেয়েদের ওপরেই এসে পড়ে। কিন্তু উচ্চশিক্ষায় উর্দু মাধ্যম কম। এখানে বিজ্ঞান শিক্ষা সীমিত। কমিটি মনে করে উর্দু মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার আরও ব্যবস্থা হলে আরও বেশি মেয়ে আসবে।

তাছাড়া উর্দু বিদ্যায়তনে যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা শিক্ষিকা থাকলে মেয়েরা স্বচ্ছন্দ বোধ করে। মহিলারা অনেকেই মুসলমান মেয়েদের জন্য ইংরাজি মাধ্যম স্কুলের কথা বলেছে। শিক্ষা-শেষে কর্মে নিযুক্তির সম্ভাবনা শিক্ষায় আগ্রহ বাড়ায়। পশ্চাদপদ হলেও মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের সুবিধা নেই। উচ্চশিক্ষায় তাই অনীহা দেখা যায়।

এত সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, মুসলমান মহিলাদের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার (৫০ শতাংশ) তফসিলি জাতি-জনজাতির চেয়ে অনেক বেশি। পশ্চিমবঙ্গে আবার দেখা গেল মুসলমান পুরুষ ও নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার ফাঁকটি (১৫ শতাংশ বিন্দু) রাজ্যের সামগ্রিক ফারাক (১৭ শতাংশ বিন্দু) থেকে কম। অর্থাৎ শিক্ষায় সামগ্রিক পশ্চাদপদতা থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে মেয়েদের প্রতি বিশেষ বঞ্চনা এই সমাজে তুলনামূলকভাবে কম। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে পাঠক্রমেও মুসলমান মেয়েদের জন্য প্রেরণাদায়ী কিছু থাকে না। সামগ্রিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গের সরকারি পাঠক্রমে কৃতি ব্যক্তিত্ব হিসেবে বর্ণহিন্দু পুরুষের ভিড়। স্বাধীনতা সংগ্রামী, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী অধিকাংশেই উচ্চবর্ণের পুরুষ। অথচ বেগম রোকেয়ার মতো একজন নারীর কথা স্নাতক স্তরে না রেখে প্রাথমিক বা মাধ্যমিকে রাখা যেত। সেটি মেয়েদের কাছে, বিশেষত মুসলমান মেয়েদের কাছে এক উজ্জ্বল প্রেরণার উৎস হতে পারত।

সাধারণভাবে এটাই ধরে নেওয়া হয় যে বাল্যবিবাহের কারণেই মুসলমান মেয়েদের পড়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তথ্য দেখিয়েছে যে সাধারণভাবে বিবাহের যে গড় বয়স, মুসলমানদের তার চেয়ে কম বয়সে বিবাহ হয় এমন নয়। এই প্রসঙ্গে এসে যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা। একটা কথা বলা হয় যে মুসলমান সমাজে বিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রথা সমাজে থাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। কিন্তু ২০০১-এর জনসংখ্যা তথ্যে দেখা যাচ্ছে বৈবাহিক অবস্থান মুসলমান মেয়েদের ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে খুব বেশি পৃথক নয়। অন্য বিষয়গুলি দেখা দরকার। ভারতীয় সমাজে স্ত্রী পুরুষের অনুপাত (১০০০ পুরুষে নারীর সংখ্যা) এমনিতেই খারাপ, ২০০১-এ পাওয়া গেছে ৯৩৩। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে এটি তুলনামূলক ভালো, ৯৩৬। আরও গুরুত্বপূর্ণ এই যে ৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে সকলের জন্য স্ত্রী পুরুষ অনুপাত যেখানে ৯২৭, সেখানে মুসলমানদের ক্ষেত্রে ৯৫০। অর্থাৎ শিশুকন্যা মেরে ফেলার প্রবণতা এখানে অনেক কম।

শিক্ষার পরেই আসে কর্মে নিয়োজনের কথা। ভারতে ১৫-৬৪ এই বয়সসীমার মধ্যে ৪৫ শতাংশ মহিলা কর্মে নিযুক্ত থাকেন, পুরুষ থাকেন ৮৫ শতাংশ। কর্ম অর্থাৎ যে কাজ সরাসরি অর্থ মূল্যে বিবেচিত হয়। মহিলাদের সাংসারিক কর্মের তো সাধারণত কোন আর্থিক মূল্যায়ন হয় না। মুসলমান মহিলাদের ক্ষেত্রে কর্মে নিয়োজন মাত্র ২৫ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে হিন্দু মহিলাদের ক্ষেত্রে যখন এটি ৭০ শতাংশ, মুসলমানদের ক্ষেত্রে সেটি মাত্র ২৯ শতাংশ। কৃষিক্ষেত্রে মুসলমান মহিলাদের অংশগ্রহণ কম, গৃহভিত্তিক শিল্পেই তাদের যোগদান বেশি। চাকরিতে সাধারণভাবেই মুসলমানদের অংশ কম নানান কারণে, মহিলাদের আরও কম। কমিটি আর একটি বিষয় দেখেছে, এই জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার তুলনায় কম বয়সী অংশ। মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ যখন দশ বছরের কম বয়সী, মুসলমানদের ক্ষেত্রে এটি ২৭ শতাংশ। এদের দেখাশোনার জন্য মহিলাদের একটা বড়ো অংশকে ঘরেই থাকতে হয়।

স্ব-নিযুক্তি ক্ষেত্রে কিন্তু এদের উল্লেখ্য যোগান দেখা যায়। কর্মে নিযুক্ত মুসলমান মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি ৭৩ শতাংশ, হিন্দুদের ক্ষেত্রে এটি ৬০ শতাংশ। মুসলমানদের ক্ষেত্রে কৃষি অপেক্ষা অ-কৃষি ক্ষেত্রেই যোগদান বেশি। মহিলা-মালিকানাধীন উদ্যোগে মহিলাদের যোগদান চোখে পড়ার মতো। এ থেকে বোঝা যায় যে মুসলমানদের মধ্যে মহিলা পরিচালিত উদ্যোগ যথেষ্ট। অবশ্য এগুলো মূলত গৃহভিত্তিক, ফলে দালালদের ওপর নির্ভরশীল, রোজগার কম। যে সমস্ত অকৃষি উদ্যোগে মুসলমান মহিলাদের প্রাধান্য, তার মধ্যে আছে শহরাঞ্চলে দর্জির কাজ, পোষাক তৈরি এবং সমজাতীয় কাজ, বিড়ি বাঁধা ইত্যাদি। এখানে রোজগার কম, কাজের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর এবং কোন সামাজিক সুরক্ষা নেই। মুসলমান মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ দিতে ব্যাঙ্ক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের অনীহা আছে। এদের কাজ মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্রে। সেখানে এরা চূড়ান্ত শোষণের শিকার। কর্মক্ষেত্রে উপযুক্ত বাথরুম বা শিশুদের জন্য ক্রেশের ব্যবস্থা নেই। এর প্রভাব পড়ে স্বাস্থ্যের উপর। যারা বিপিএল তালিকাভুক্ত, তারাও সহজে জওহর রোজগার যোজনার ঋণ পায় না, সেখানে সম্প্রদায়গতভাবে তারা বৈষম্যের শিকার।

পশ্চিমবঙ্গে ৩০০০টিরও বেশি মুসলমান-প্রধান গ্রামে কোনও স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই। সাধারণভাবেই মুসলমান-প্রধান গ্রামগুলিতে পরিকাঠামোগত সুযোগের অভাব। দারিদ্র্য অত্যন্ত বেশি।

কৃষিজমি অধিগ্রহণ, 'সেজ' নির্মাণ ইত্যাদি 'শিল্পায়ন' অভিমুখী কর্মসূচী মুসলমান মহিলাদের বিশেষভাবে বিপন্ন করে তুলেছে। যেহেতু তারা কুটির শিল্পে নিয়োজিত, বাণিজ্যিক আগ্রাসন সেটিকে বিধ্বস্ত করলে তাদের জীবিকার পথ বন্ধ। জমির মালিকানাতেও মুসলমান মেয়েদের কিছু অংশ থাকে। কিন্তু উচ্ছেদের পর যে কারখানা তৈরি হবে, সেখানে তাদের রোজগারের কথা কেউ ভাবছে? অধিকাংশ মেয়েরাই শিল্পের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পায়নি, বাইরের কাজ করতেও তারা অনভ্যস্ত। তাছাড়া 'সেজ' নামক উপনিবেশে তাদের জন্য শ্রমিক-সুরক্ষা কতটা জুটবে? ঠিক এই কারণেই কিন্তু

... শেষাংশ ২৩ পৃষ্ঠায়

পাঠকসভার বিবরণ

অমিতা সান্যাল

মার্চ–এপ্রিল ২০০৭ সংখ্যার মন্থন–এ একটি পাঠকসভার ঘোষণা ছিল। সেইমতো গত ২৬ মে শনিবার বিকেলে একবালপুরে সভাটি হয়। গত সংখ্যার বিষয়টিই ছিল পাঠকসভার আলোচ্য। প্রথমে ছয়–সাতজনকে নিয়ে সভা শুরু হলেও একটু দেরিতে আরও ছয়জন একে একে এসে যোগ দেন। ফলে একটু অগোছালো ভাবে আলোচনা এগোতে থাকে। আকারে ছোটো হলেও সভাটিতে যেসব প্রশ্ন, সমালোচনা এবং মতামত প্রকাশ করা হয়, তার ওপর কিছুটা কথোপকথন চলে, কিছু প্রস্তাবও আসে। সংক্ষেপে এই সভার বিবরণ প্রকাশ করা হল, বৃহত্তর পাঠকসমাজের জ্ঞাতার্থে। তাঁরাও যাতে নিজেদের মতামতগুলি প্রকাশ করেন সেই আহ্বান জানানো হচ্ছে।

'ওসমানচক থেকে মেয়েরা বলছি' — নন্দীগ্রাম বিষয়ক এই প্রতিবেদনে অ'বোলা' শব্দটির ব্যবহার কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। 'অবলা' শব্দটির সাথেই সবাই পরিচিত। প্রবাল দাশগুপ্ত বলেন, মেয়েরা এখন অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। তাই নতুন করে একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এতে লেখিকার একটা নারীবাদী ঝোঁক প্রকাশ পেয়েছে। পক্ষান্তরে লেখিকার যুক্তি হল, মেয়েরা অনেক ব্যাপারে অনেকটাই এগিয়ে আসা সত্ত্বেও সমাজে মেয়েদের অবস্থান এখনও সমান–সমান নয়। বর্তমান পর্যায়ে ভূমি উচ্ছেদ বিরোধী লড়াইয়ে, বিশেষত নন্দীগ্রামে মেয়েদের যে ভূমিকা, যে স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, তা ওই আন্দোলনের প্রকৃত গণচরিত্রকে প্রমাণ করে। কিন্তু ১৪ মার্চের পুলিশি অত্যাচার, গুলিচালনা ও গণহত্যার ঘটনায় সরকারপক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে যে ওইদিন মহিলাদের আন্দোলনকারীরা সামনে এগিয়ে দিয়েছে, ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি আন্দোলনকারী মাত্রেই পুরুষ? মহিলারাও যে সক্রিয় আন্দোলনকারী, তারাও যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশীদার, সেটা বোঝাতে গিয়ে মেয়েদের কথার ওপর কিছুটা জোর পড়েছে।

প্রবালবাবুর দ্বিতীয় প্রশ্ন : 'যেখানে সমাজ উঠে দাঁড়িয়েছে প্রতিরোধে' নামক প্রতিবেদনে 'কৌমস্মৃতি' কথাটি কেন ব্যবহার করা হয়েছে? উত্তরে লেখক বলেন, কৌমজীবনের কিছু কিছু গৌরবের ইতিহাস মানুষের স্মৃতিতে রয়ে যায়। যেমন, নন্দীগ্রামে — বিপদের সময় শাঁখ বাজানো, দারোগা পোড়ানো, তেভাগা আন্দোলন, ভূপাল পাণ্ডার ভূমিকা ... এই সবই মানুষের স্মৃতিতে রয়ে গেছে। একেই 'কৌমস্মৃতি' বলা হয়েছে।

এছাড়া, প্রবালবাবুর মতে, মার্চ–এপ্রিল সংখ্যার মন্থন–এ নন্দীগ্রামের মানুষের পেশাগত বিন্যাস এবং তার জীবন–জীবিকার সামগ্রিক চিত্রের অভাব আছে। মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট গেজেট থেকে একটা প্রাথমিক ধারণা তৈরি করে তারপর নন্দীগ্রামে গেলে, ওখানকার মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে হয়তো একটা ছবি পাওয়া যেত।

মন্থন–এর পাঠকসভায় মাঝে মাঝে যোগ দেন পঞ্চাদ্রি কর্মকার, এখন কর্মসূত্রে থাকেন উত্তরপ্রদেশে। সেখানে চম্বলের তরাই অঞ্চল পাতা–য় গ্যাস অথরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (GAIL) কোম্পানিতে বছর খানেক হল যোগ দিয়েছেন। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের ঘটনা ওখানকার বাঙালিদের মধ্যে কী প্রভাব ফেলেছে, সে কথা তিনি বললেন। ওখানে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে নানারকম প্রচারে, মমতা গিয়ে সিঙ্গুর–নন্দীগ্রামে ঝামেলা করছে, শিল্পায়নে বাধা দিচ্ছে। ওখানে যখন GAIL–এর এই প্ল্যান্টটা তৈরি হয়, তখন সেখানকার মানুষকে সরিয়ে দিয়েই করা হয়। কিন্তু স্থানীয় মানুষ ওই প্ল্যান্টে কিছু কিছু কাজ পেয়েছে, কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি। ফলে ওই প্রবাসী বাঙালিদের প্রশ্ন, কৃষকের ছেলে যখন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে, সে কি আর চাষবাস করবে নাকি চাকরি করতে চাইবে? পঞ্চাদ্রির মতে, এখানকার এই আন্দোলন কোনও আশাব্যঞ্জক জায়গায় পৌঁছাচ্ছে না, একটা স্থিতাবস্থা তৈরি হচ্ছে।

এই কথার সূত্র ধরে গৌতম গাঙ্গুলি বললেন, শিল্পায়ন শিল্পায়ন করে কিন্তু শিল্প আর SEZ–কে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। SEZ মানে কী? যেমন, Dow Chemicals–এর লোকজন চীনের শেনঝেন প্রদেশের ওপর দিয়ে এরোপ্লেনে করে যাওয়ার সময় একটা গ্রাম দেখে বলল, এটা চাই। তাদের সেটা দিয়ে দেওয়া হল। ভারতেও সর্বত্র এই কুৎসিত জিনিসটা শুরু হয়েছে। আবার 'বাম' মতাদর্শ দিয়ে তার অনুমোদন করা হচ্ছে। সুতরাং যারা এর বিরোধিতা করছে তারা আর 'বামপন্থী' নয়, নির্ঘাত 'মাওবাদী'!

গৌতমবাবুর দ্বিতীয় কথাটা হল টিভি–র ভূমিকা নিয়ে। দীর্ঘদিনের আন্দোলনহীনতার পর সিঙ্গুর–নন্দীগ্রামে জোর করে কৃষিজমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে যখন আন্দোলন শুরু হল, তাকে ঘিরে একটা সামাজিক আলোড়ন তৈরি হতে সাহায্য করল টিভি। টিভি–র মতো অডিও–ভিসুয়াল মাধ্যমে ওখানকার ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করার ফলে জনমানসে একটা ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। না–হলে সিপিএম সব ম্যানেজ করে নিত।

এই বক্তব্যকে ঘিরে কিছুটা তর্ক চলে। প্রশ্ন ওঠে, নকশালবাড়ি আন্দোলনের সময় তো টিভি ছিল না। কিন্তু সেই আন্দোলনের প্রভাব তো গোটা সমাজ জুড়ে যথেষ্ট পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ে। আর একজন বলেন, টিভি–র ভূমিকা কি সবটাই ইতিবাচক বলা যায়? কী দেখিয়েছে টিভি–তে? পুলিশের অত্যাচার — লাঠি গুলি ধর্ষণ এবং তার বিরুদ্ধে শহরের ছাত্র–বুদ্ধিজীবী–আইনজীবী–সাংস্কৃতিক কর্মী আর লিট্‌ল ম্যাগাজিন কর্মীদের প্রতিবাদ, মহা সমারোহে ত্রাণ পৌঁছানো ইত্যাদি। আসলে যে সেখানকার কৃষিজীবী মানুষের গণ–প্রতিরোধ তাকে কি হাইলাইট করা হয়েছে বা হচ্ছে? সাধারণ মানুষের কথাকে ছাপিয়ে তৈরি করা হচ্ছে একটা দলীয়তার বাতাবরণ। কাল্পনিকভাবে ধরা যাক, যদি টিভি না থাকত, তবে আন্দোলনের যুক্তিতেই তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ত, মানুষের মধ্যে এই লড়াইয়ের একটা জোরালো ছাপ থাকত, আত্মবিশ্বাস বাড়ত। মিডিয়া যখন প্রচার করে, মানুষের সামনে ঘটনাগুলোর ছবি নিজেদের মতো করে সাজিয়ে হাজির করে। ফলে পুরো ব্যাপারটা সিপিএম বনাম তৃণমূলের গণ্ডগোল — এভাবেই তারা দেখিয়েছে এবং তাই দাঁড়িয়েছে।

গৌতমবাবু আরও বলেন, সিঙ্গুর–নন্দীগ্রাম নিয়ে বিভিন্ন লিট্‌ল ম্যাগাজিনে বহু ভালো ভালো লেখা বেরিয়েছে। সেগুলির একটি সংকলন করা দরকার। একই বিষয় নিয়ে যারা ভাবছি লিখছি

আন্দোলন করছি, তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। এটা খুব বাজে ব্যাপার। সবাইকে একটা জায়গায় আনা যায় কিনা ভাবা দরকার। রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা চালানো দরকার যাতে একটা সাধারণ রাজনৈতিক লাইন বের হয়। পশ্চিম বাংলায় বাম আন্দোলনে আগে তথ্যভিত্তিক আলাপ-আলোচনার ব্যাপারটা ছিল না, এখন কিছু কিছু আসছে। মধ্যপ্রদেশের সালওয়া জুডুম* নিয়ে 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি'-তে প্রচুর লেখাপত্র বেরিয়েছে। এখানে তেমন নেই। সমন্বয় সাধন বা কো-অর্ডিনেশন একটা জরুরি কাজ। এখানে যেসব কো-অর্ডিনেশন এখন হচ্ছে, তাতে নিজেদের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক মিল নেই।

প্রশ্ন ওঠে, কী করলে কো-অর্ডিনেশন তৈরি হবে? তার চরিত্র কী হবে? মন্থন-এর এক্তিয়ারই বা কতটা?

মার্চ-এপ্রিল ২০০৭ সংখ্যার মন্থন সম্পর্কে পত্রিকার পাঠক, যাঁরা সভায় উপস্থিত হতে পেরেছেন তাঁদের নিজেদের এবং সভায় অনুপস্থিত কিছু পাঠকের মতামত অন্যদের কাছে পাওয়া গেল।

সুকুমার মিত্রের লেখা 'আড়াই মাসের যুদ্ধ' নিয়ে বেশ আলোড়ন হয়েছে। হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প বিরোধী আন্দোলনের ক্রমপঞ্জি অনেকের পছন্দ হয়েছে।

দখল আন্দোলন নিয়ে শমীক সরকারের লেখাটি অনেকের বেশ ভালো লেগেছে। তবে একজন ছাত্রের মতে, লেখাটায় আর একটু জোর দেওয়া, বিস্তারিত করার দরকার ছিল। একজন পাঠক জানিয়েছেন, মন্থন-এ অন্যরকম প্রতিবেদন দেখা যায়, কিন্তু তার মধ্যে এক ধরনের রাজনীতি থাকে। শমীক সরকারের লেখাটিতে দখলের চরিত্র নিয়ে কিছু বলা নেই। বিশ্ব জুড়ে সব ধরনের আন্দোলনের সাধারণীতে চরিত্রটা দেখা যাচ্ছে। তাঁর মতে, এখনকার আন্দোলনগুলির চরিত্র হল, পার্টি বা দলীয় রাজনীতির গণ্ডীকে ছাপিয়ে যেতে চাওয়া।

একজন প্রশ্ন করেছেন, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ক্ষেত্রে মেয়েদের ব্যাপারটাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কেন মন্থন-এ? আন্দোলন তো সবারই।

দুর্গাপুরের একজন পাঠক জানিয়েছেন, মন্থন খুবই তথ্য সমৃদ্ধ পত্রিকা, কিন্তু তাতে বিশ্লেষণ কম থাকে। আলিপুরদুয়ার থেকে একজন গ্রাহক ফোনে বলেছেন, পত্রিকা তাঁর খুবই ভালো লাগছে, তবে সব লেখা ঠিক বোঝা যায় না, একটু কঠিন লাগে। সেই লেখাগুলিকে চিহ্নিত করে জানানোর জন্য ওঁকে অনুরোধ করা হয়।

সভায় উপস্থিত এক পাঠক জানালেন, জিতেন নন্দীর লেখা 'যেখানে সমাজ উঠে দাঁড়িয়েছে প্রতিরোধে' এবং রঘু জানার লেখা 'শিল্পনগরী হলদিয়া, একটুকরো অভিজ্ঞতা' তাঁর ভালো লেগেছে। কিন্তু 'তেভাগার নন্দীগ্রাম' ইতিহাসের লেখায় (পুনর্মুদ্রণ) এত নামের প্রাচুর্য কেন?

রঘু জানার লেখাটি ভাল লেগেছে এমন আর একজনের মত হল, খুব আবেগধর্মী একটু দার্শনিক গোছের লেখা, কিন্তু কিছু কিছু তথ্য দিলে ভালো হত। লেখাটিতে একটা গ্রামকেন্দ্রিক স্মৃতিমেদুরতা তৈরি হচ্ছে, এখন আবার এই বিষয়ে রঘু জানার লেখা উচিত।

এক পাঠিকা জানালেন, মন্থন-এর এই সংখ্যার প্রচ্ছদ ভালো লেগেছে, কবিতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে পত্রিকায় বিকল্প পথ নিয়ে খোঁজ থাকলে ভালো হয়।

শেষে আর একজন বললেন, অনেক জায়গায় মন্থন যাচ্ছে না। বিশেষত উত্তরবঙ্গ, আসানসোল, মুর্শিদাবাদ — এসব জায়গায় পত্রিকা পৌঁছানো উচিত। আর পাঠকসভাও বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করা উচিত।

তাঁর প্রস্তাবের যৌক্তিকতা নিয়ে কিছুটা কথা হয়। আসানসোলে পত্রিকা যায়, উত্তরবঙ্গেও পাঠানো হয়েছে, তবে একটু অনিয়মিত। চেষ্টা থাকে। তবে এইসব কাজে আরও কিছু সাহায্যের হাত না এগিয়ে এলে, নিজেদের সাধ্যের বাইরে প্রচার-প্রসার ঘটাতে গেলে পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করা এবং তার মান উন্নত করা সম্ভব হবে না। এই আশংকা থেকেই যায়। পাঠকসভা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করার প্রস্তাবটি ভালো, আগেও ভাবা হয়েছে, তবে বিভিন্ন অঞ্চলে পত্রিকার যে লেখক-পাঠক বন্ধুরা আছেন তাঁদের উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

২০০৫ সালের জুন মাসে ছত্তিশগড় সরকার হতদরিদ্র দান্তেওয়াড়া জেলায় 'সালওয়া জুডুম' অর্থাৎ শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে এক বিদ্রোহ দমনের কর্মসূচী হাতে নেয়। মাওবাদী দমনের নামে হাজার হাজার সাধারণ গ্রামবাসীকে ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য করা হয়।

'টপ কোয়ার্ক'-এর রূপকার আজ আর নেই

শমীক মুখোপাধ্যায়

'লড়াই' শব্দটি যার কাছে ছিল ইষ্টনামের মতো অনিবার্য এবং বিনা লড়াইতে এক ইঞ্চি জমিও না-ছাড়ার মনোভাবে যে ছিল সংহত, সেই মানুষটি কোন মানসিকতার বশবর্তী হয়ে জীবনের ময়দান থেকে চিরতরে নিজেকে সরিয়ে নিল, তা হয়তো মনোবিদ বা সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয়। কিন্তু যাঁরা তাকে কাছ থেকে দেখেছেন, বিভিন্ন প্রসঙ্গে যাঁরা মত বিনিময় করেছেন, যাঁরা শরিক হয়েছেন তার কর্মকাণ্ডের, এমনকি যাঁদের সঙ্গে ছিল প্রবল মতানৈক্য — শতহাত দূরত্ব রেখে চলাফেরা করেছেন এবং অন্ধ বিরোধিতা করেছেন প্রত্যেক প্রশ্নে, তার আত্মঘাতের এই চরম সিদ্ধান্তে সেইসব পরিচিত মানুষ নির্বিশেষে হতবাক বইকি।

কখনও 'পরিবেশবিদ'-এর তক্‌মা দিয়ে তার সংগ্রামী তৎপরতাকে সচেতনভাবে খণ্ডিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, কখনও 'পরিবেশবাবা' এই অভিধায় তার তাবৎ কর্মকাণ্ডকে সুচতুরভাবে গুরুত্বহীন করার প্রচেষ্টা জারি থেকেছে। আর, সে নিজে অবশ্য এই সব কৌশলী বিশেষণ-ব্যাপারে আদ্যন্ত উদাসীন থেকে নিজের পরিচয় দিয়েছে 'অ্যাক্টিভিস্ট' রূপেই। দিক নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি দূষিত ক্ষেত্রেই নিজের উদ্যোগকে ব্যাপ্ত করে আপন বিশ্বাসের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছিল সে। ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে-বিশ্বাসে-বোধে সে হয়ে উঠেছিল আপসহীন প্রতিবাদী এক যুবক।

বিজন ষড়ঙ্গী।

নিঃসঙ্গ পথচলাকেই জীবনের মন্ত্র করে একদিন শুরু করেছিল সংগ্রামের পথচলা। গত শতকের শেষ দশকের শুরুতে 'কোয়ার্ক' নামে একটি

গণবিজ্ঞান পত্রিকার প্রকাশের মাধ্যমেই সূচনা হয়েছিল সেই যাত্রার। মানুষ হিসেবে কিছু করণীয় রয়েছে এই পৃথিবীর জন্য, এমন অন্তরতর উপলব্ধিটা কিন্তু এসে থমকে পড়েনি পৃথিবীর বিশালতা এবং মানুষের অসংখ্যের ভাবনার মুখে এসে। আবার, জনবল এবং অর্থবলে সমৃদ্ধ কোনও সংগঠনের শরিক হয়ে নিজের মহৎ সেই ইচ্ছেটাকে অনুকূল একটা প্রেক্ষিতে মুক্তি দিতেও মন সরেনি তার। সীমিত সামর্থ্যকে পুঁজি করে আর দু'তিনজন সহযাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গণবিজ্ঞান পত্রিকাটি সম্পাদনার মধ্যে দিয়ে, ঘর থেকেই শুরু হয়েছিল তার সামাজিক কর্মকাণ্ড।

মানুষের অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারকে আক্রমণ করে ছাপা হতে থাকে মূল্যবান লেখাপত্র, সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ক আরও কিছু লেখা। স্কুলে শিক্ষকতার সময়টুকু বাদ দিয়ে তখন সে সর্বক্ষণের বিজ্ঞানকর্মী। পত্রিকার লেখা জোগাড় করা থেকে প্রুফ সংশোধনের কাজ এবং প্রকাশিত পত্রিকা উৎসাহী পাঠকবর্গের দরবারে পৌঁছে দেওয়া। খুব স্বাভাবিকভাবেই হাতে গোণা সেই সহযাত্রীদের একে একে পত্রিকার জগতের পরিমণ্ডল থেকে অপসরণ ঘটেছিল। আর, বিজনদার একক উদ্যোগে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকা পত্রিকাটি ঝাড়গ্রামের গণ্ডি ছাড়িয়ে ক্রমে মেদিনীপুর-কলকাতা-পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পরিচিত হতে থাকে। লেখকগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে ততদিনে – বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে পৌঁছাচ্ছে লেখাপত্র —— মানোন্নয়ন ঘটে চলেছে পত্রিকাটির। জন্মান্তরবাদ থেকে জ্যোতিষশাস্ত্র, ধর্মান্ধতা থেকে অপচিকিৎসা বিষয়ক মূল্যবান লেখাগুলি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়ে পৌঁছায় পাঠকের হাতে।

কিন্তু কেবল সম্পাদনার কাজেই তো আবদ্ধ থাকতে চায়নি সে, একমাত্র এটিকেই তার কর্তব্য বলে মেনে নিতে পারেনি। তার অভীষ্ট যে অন্য কিছু —— এই পত্রিকা বরং সেই কর্মকাণ্ডের একটি অঙ্গই ছিল।

তেমন কাজে আত্মনিয়োগের সুযোগও এসে যায় ঝাড়গ্রাম শহরের উপকণ্ঠে চিঁচুড়গেড়িয়া গ্রামস্থ কোয়ার্টজাইট পাথর গুঁড়ো করার সংস্থা থেকে সৃষ্ট দূষণ সূত্রে। সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত শ্রমিকদের মৃত্যুর মিছিল শুরু হয়, যেটিকে মালিকপক্ষ অত্যধিক মদ্যপানজনিত ব্যাধির যুক্তিতে বাঁধতে চায়। রুখে দাঁড়ায় বিজনদা। সঙ্গীহীন, সহানুভূতিশীল মানুষহীন, বিত্তহীন সেই মানুষটি কেবল ভালোবাসা, অসম সাহস আর আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করে অসহায় শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে কোটিপতি মালিকপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করে । তার পাশে এসে দাঁড়ায় কলকাতার নাগরিক মঞ্চ —— যৌথ উদ্যোগে মামলা হয় সর্বোচ্চ আদালতে। ঐতিহাসিক জয় পায় শ্রমিকরা। মৃত শ্রমিকদের পরিবারের এবং অসুস্থ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি ঘটে উপযুক্ত হারে, সেই অর্থের অপচয় ঠেকাতেও উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেয় বিজনদা।

আন্দোলনটা বিক্ষিপ্ত প্রচারের আলো পেয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গটিও। কিন্তু প্রাপ্ত অর্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে সুরক্ষিত রাখতে তার গৃহীত উদ্যোগটি ছিল সম্পূর্ণ নিভৃতেই। তাবৎ প্রচারের আলোর আড়ালের নিভৃত এই উদ্যোগটিই কিন্তু চিনিয়ে দেয় মানুষটির জাত। আসলে নক্ষত্র হওয়ার বাসনায় মানুষের জন্য লড়াই করেনি সে —— তার সমস্ত কর্মকাণ্ডের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে ন্যায়ের ঠিকানা দেওয়া।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য একটাই —— আমরা অধিকাংশই তো বিজনদার সংগ্রামকে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হিসেবে দেখে দূরে সরে থেকেছি। কেউ কেউ আবার সেই সংগ্রামের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করেও আঁচ বাচাতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলেছি। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও দ্বিধান্বিত হয়নি সে —— সহসা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দু'মিনিট ভাবেনি —— পিছন ফিরে তাকায়ওনি কারও প্রতীক্ষায়। ঠোঁটের কোণের চিরাচরিত তীব্র বিদ্রূপাত্মক হাসির সুতীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে সমস্ত কাপুরুষতা, ক্লীবত্বকে ফালাফালা করে সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ উজ্জ্বল অস্তিত্ব নিয়ে সর্ববাধাবিনাশী পদক্ষেপ ফেলেছে সম্মুখে। প্রতিপক্ষ কখনও রাষ্ট্র, কখনও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, কখনও রাজনৈতিক দল; যেই হোক, পৃথক কোনও তাৎপর্য পায়নি তার বিবেচনায়। টলেনি সে, মুহূর্তের জন্যও শিথিল হয়নি —— দৈহিক আর্থিকভাবে সর্বস্বান্ত হয়েছে —— সব সময়ে যে জয় এসেছে এমনও নয় —— তবু শেষ দেখে তবে ছেড়েছে।

এইভাবে দ্রুত পত্রিকাটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে —— যেমন লেখায় তেমনি অঙ্গসজ্জায় —— 'টপ কোয়ার্ক' নামে তা নিবন্ধীকৃত হয়। বিগত ষোল বৎসরে প্রকাশিত অর্ধশতাধিক সংখ্যার উল্লেখযোগ্য ক'টি :

১) উদ্দালক আরুনি ও সমকালীন ভারতবর্ষ, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯২
২) জন্মান্তরবাদ, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৩
৩) মরণোত্তর দেহদান, ডিসেম্বর-মার্চ ১৯৯৭-৯৮
৪) জ্যোতিষশাস্ত্র ভ্রান্ত :প্রতারিত হবেন না,
ডিসেম্বর-জানুয়ারি ১৯৯৮-৯৯
৫) বিকল্প শক্তির সন্ধানে, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০০০
৬) বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতিষ : ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিত
জুন-সেপ্টেম্বর ২০০১
৭) গুজরাত —— ফ্যাসিবাদের মুখ, আগস্ট-নভেম্বর ২০০২
৮) বিদ্যালয়স্তরে যৌনশিক্ষা, জুন-নভেম্বর ২০০৩
৯) শরীর বিক্রির ব্যবসা কি পেশা হতে পারে?
ডিসেম্বর-আগস্ট ২০০৪-০৫
১০) পশ্চিমবঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৫

দ্বিমাসিক পত্রিকাটিকে ঠিক সময় বেঁধে সেভাবে কোনোদিনই প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি নানা প্রতিকূলতায়। তবু প্রকাশিত প্রতিটি সংখ্যাই ছিল তুমুলভাবে তার ব্যক্তিত্বে চিহ্নিত।

জীবনের শেষ সংগ্রাম তার ঝাড়গ্রাম মহকুমাস্থিত বিনপুর থানার কালিয়াম গ্রামে একটি বৃহৎ নির্মাণ কোম্পানির পাথর খাদান বানানোর অশুভ উদ্যোগের বিরুদ্ধে। একদিকে অর্থবল এবং বাহুবল সমৃদ্ধ সেই ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং অপরদিকে নিঃসঙ্গ এবং আক্ষরিক অর্থেই নিঃসঙ্গ বিজনদা। এ ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত জয় পায়নি সে। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের মুখে সে ফোটাতে পারেনি হাসি। কিন্তু লড়াই দিয়ে গিয়েছে প্রাণপণ। বিশেষত এই প্রশ্নে কলকাতার পরিবেশ আদালতে ধর্মাবতার শ্রীভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এজলাসে প্রতিপক্ষের প্রখ্যাত ব্যারিস্টারের বিরুদ্ধে অনভিজ্ঞ হয়েও যে লড়াই সে দিয়েছে, তার সাক্ষী পরিবেশ দপ্তরের তৎকালীন ল' অফিসার বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় এবং প্রখ্যাত ব্যারিস্টার গীতানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। অভিভূত গীতানাথবাবু বিজনদার পিঠ চাপড়ে ভবিষ্যতে তাঁদের পেশাগত প্রতিবন্ধকতার আশঙ্কাসূচক এক সরস মন্তব্য সেদিন করেছিলেন।

অনিয়মিত হতে হতে গত প্রায় একবছর 'টপ কোয়ার্ক'-এর একটি সংখ্যাও প্রকাশিত হয়নি। অথচ হাতে লেখা ছিল অনেক, সম্পাদিতও করে রেখেছিল সেসবের বেশ কিছু। সেই অর্থে বিজ্ঞাপনেরও অনটন ছিল না আর তাঁর উপার্জিত অর্থের একটা অংশও ছিল এই কাজে বরাদ্দ। তা ছাড় একটা সংখ্যার ডিটিপি-র কাজও সম্পূর্ণ হয়ে প্রেসে ফাইলবন্দী হয়ে

পড়েছিল ট্রেসিং। এ সকল সত্ত্বেও প্রাণপ্রিয় পত্রিকাটি, তার কথায় প্রথম সন্তান, দীর্ঘদিন রয়ে গিয়েছিল অপ্রকাশিত।

বিজনদা অসুস্থ ছিল, মানসিকভাবে অসুস্থ — গভীর বিষন্নতা আচ্ছন্ন করেছিল তার চেতনাকে। কীভাবে কোন সুচতুর কৌশলে কালান্তক সেই অসুখ দুর্ভেদ্য বর্ম ছিন্ন করে চেতনার সুসজ্জিত বাসরে প্রবেশ করেছিল, সেই প্রশ্ন আলাদা। তবে ইদানীং অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, তার কথাবার্তা এবং আচরণে প্রবল হতাশা। পত্রিকা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছে, 'কার জন্য পত্রিকা করব? ... এতদিন বন্ধ থাকার কারণ জানতে চেয়ে একটা চিঠিও আসেনি।' প্রসঙ্গান্তরে বলেছে কখনও, 'কী নির্লজ্জ স্বার্থপর, কী আত্মকেন্দ্রিক আমাদের শিক্ষিত যুবসমাজ! পথেঘাটে ঘরে বাইরে প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলেছে কত অনাচার — তবু আশ্চর্য রকম নির্বিকার। কেবল নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলেই সে তখন সংগ্রামী।' একদা সাধের ফ্ল্যাট বাড়িটির প্রসঙ্গে বলেছে, 'এক এক সময়ে মনে হয়, দেওয়ালগুলো যেন চারপাশ থেকে এসে পিষে মারতে চায়।' এইসব স্বভাববিরুদ্ধ কথাবার্তা আর আচরণ থেকে এটুকুই কেবল স্পষ্ট হয়েছে যে বিজনদা হতাশায় আক্রান্ত। একজন বিবেকবান-সহানুভূতিশীল-সমাজমনস্ক মানুষের পক্ষে বর্তমান বন্ধ্যা পৃথিবীর পরিবেশে যা বোধহয় খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অন্তরে ঘনীভূত বিষন্নতা যে তাকে জীবনের অমন মর্মান্তিক পরিণতি ঘটাতে বাধ্য করবে, তা নিকটজনেদের কেউই ঘুণাক্ষরেও অনুমান করতে পারে নি। বিজনদার হঠকারিতার মতো এই অপদার্থতাও ক্ষমার নয়।

পরিশেষে একটাই কথা বলার, 'টপ্ কোয়ার্ক'-এর মতো অমন উৎকৃষ্ট মানের গণবিজ্ঞান পত্রিকার প্রকাশ অথবা বিপন্ন শ্রমিক বা গ্রামবাসীদের ন্যায় প্রদানে নেতৃত্ব দেওয়ার মধ্যেই কিন্তু বিজনদার সংগ্রামের তাৎপর্যের সন্ধান করলে মূল্যায়নটা বড়োই খণ্ডিত হবে। বরং তাকে অনেক বেশি আপনার করে-ঘনিষ্ঠভাবে-সহজ রূপে পাওয়া যাবে দৈনন্দিন জীবন চর্যার মধ্যেই। অর্থাৎ শকুনের মতো লুব্ধ দৃষ্টিতে গো-ভাগাড়ের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে না থেকে কাক হয়ে শহরের যত্রতত্র আবর্জনার নিষ্কাশনে তৎপর থেকেছে সে নিয়ত।

প্রায় দেড়যুগ আগে ঝাড়গ্রামের 'কফি হাউস' কোর্ট রোডস্থ 'পান্থসখা' হোটেলে তখন চলেছে কবি-সাহিত্যিকদের আড্ডা। হঠাৎই পার্শ্ববর্তী সুভাষচক এলাকা থেকে চকিতে ছিটকে আসে প্রবল আর্ত চিৎকার, ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায় সমস্ত দোকানের। এলাকা থেকে দ্রুত সরে পড়ে মানুষজন। ছুটে যায় বিজনদা, দেখে রাস্তায় চিৎ হয়ে শুয়ে নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে আসা রক্তাপ্লুত পেট চেপে ধরে ছুরিবিদ্ধ এক কিশোর প্রায় নিস্তেজ। সদ্যযুবক বিজনদা সেদিনও ছিল নিঃসঙ্গ, সামনে-পিছনে-ডাইনে-বাঁয়ে কেউ নেই। ধমকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে এক রিক্সাওয়ালাকে ডেকে আহত কিশোরটিকে তাতে চাপিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে সে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় আর একটি ঘটনাও বছর দশেকের পুরনো। ঝাড়গ্রাম শহরের রঘুনাথপুরস্থ এক প্রৌঢ়া একদিন ছেলের সঙ্গে বিধ্বস্ত অবস্থায় আসে বিজনদার কাছে। তার পাশের বাড়ির একটি শিশুর অসুখ না সারাটা ডাইনিত্বের অভিযোগ হয়ে বিদ্ধ করে তাকে। সর্বশক্তি দিয়ে ওই প্রৌঢ়ার পাশে দাঁড়ায় বিজনদা — তার পক্ষে জনমত গঠন করে এলাকায়। শুধু তা-ই নয়, মহিলার আহত অন্তরের উপশমেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে ভোলে না।

আসলে এ সকল প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ একটাই — গণবিজ্ঞান পত্রিকা নিশ্চিত আরও প্রকাশিত হবে ভবিষ্যতে। উন্নততর রচনাও অনেক মুদ্রিত হবে তাতে। পত্রিকা গিয়ে পৌঁছবে ব্যাপকতর মানুষের কাছে। বিজ্ঞানের পক্ষে নিশ্চিত গঠিত হবে জনমত, নানাভাবে উপকৃত হবে মানবসমাজ। কিন্তু নিজের সংগ্রামী কর্মকাণ্ডকে দৈনন্দিন জীবনাচরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করা মুষ্টিমেয় ক'জন মানুষের একজন পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেল চিরতরে।

এ ক্ষতি কেবল ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষের নয়। অপূরণীয় এ ক্ষতি সভ্যতার।

সাচার রিপোর্টে নারী ... ১৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ

শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের গফুর গ্রামের বর্ণহিন্দুর শত নির্যাতন সত্ত্বেও আমিনাকে নিয়ে চটকলে যেতে চাইছিল না। পরিস্থিতি আজও একইরকম। বড়ো জোর এদের কাছে জুটতে পারে 'শিল্পায়ন'-এর ক্ষীর-খাওয়া বাবুদের বাড়ির ঝি-গিরি। সেখানে নাম ভাঁড়িয়ে খাটতে হবে, যেমন কলকাতা শহরে প্রতিদিন অজস্র মুসলমান মেয়ে হিন্দু নামে কাজ করে। পাশাপাশি, পর্যটন বা স্বাস্থ্য-শিল্পের অবশ্যম্ভাবী বাইপ্রোডাক্ট 'বিনোদন-শিল্প' অর্থাৎ কিনা দেহ বিক্রির বিকল্প তো আছেই!

সাচার কমিটি রিপোর্টে এটি স্পষ্ট যে সাধারণভাবেই ভারতের মুসলমান জনসমাজ বৈষম্য, বঞ্চনা, অবিশ্বাস, অবহেলা, হিংসার শিকার। এদের সম্পর্কে সংবাদমাধ্যম বা অন্যান্য গণমাধ্যমেও যে ছবিটি তৈরি করা হচ্ছে সেটি পক্ষপাতদুষ্ট। প্রকৃত তথ্য সামনে আসছে না। সামগ্রিক বঞ্চনার মধ্যে মেয়েদের বঞ্চনার ভাগটা স্বভাবতই আরও অনেক বেশি। কিন্তু যেভাবে তার দায়টা সম্প্রদায়ের ওপর, ধর্মমতের ওপর চাপানো হচ্ছে, সেটি উদ্দেশ্যমূলক। রাষ্ট্র তার ভূমিকা অস্বীকার করতে পারে না, দায় এড়াতে পারে না বৃহত্তর সমাজ। মেয়েদের জন্য কিছু করার তাগিদে রাষ্ট্র যা করে সেটি কল্যাণমূলক কাজকর্মেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবতাকে এড়িয়ে কিঞ্চিৎ দান খয়রাতের চেষ্টা।

কলকাতা লিট্‌ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্র-এ টপ কোয়ার্ক-এর সংখ্যাগুলি পড়ুন

গ্রাম বাদ্দ কিছু বাড় আর ইনজেকশন, যাতে তারা সুস্থ সন্তানের জন্ম দেয়। অথচ হাসপাতালগুলির অবস্থা ভয়ঙ্কর। রাষ্ট্র এই বলে খালাস যে এরা হাসপাতালে যেতে চায় না। সাক্ষরতার স্লোগান হল — সাক্ষর মায়ের সন্তান কখনও নিরক্ষর হয় না। রাষ্ট্রও শেষ পর্যন্ত মেয়েদের সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ছাড়া আর বেশি কিছু ভেবে উঠতে পারে না। অথচ আমরা দেখছি সাম্প্রতিক কৃষি জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আন্দোলনে হাজারে হাজারে মেয়েরা পথে নেমেছেন। নন্দীগ্রামে হাজার হাজার মুসলমান মহিলার জমায়েত হয়েছে।

কতদিন আর এই দায় এড়ানো হবে?